বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা

সুব্রত গুপ্ত

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আমার বাবা

৺যোগেশচন্দ্র গুপ্ত'র

স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া দুরূহ ব্যাপার। আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে স্বামীজীকে একটি বিশেষ দিক থেকে বিচার করলে হয়ত তাঁর সম্বন্ধে সব কিছু বলা যাবে না। তাঁর চিন্তাধারা এত ব্যাপক ও এত গভীর যে তার মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন। বিবেকানন্দ শুধু মানবপ্রেমিক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী-ই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক যাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয় জীবনের, সমাজের ও দেশের সর্বক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। যে পটভূমিকায় বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা একটি বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আলোচনা বইটির প্রথমেই করা হয়েছে, বিশেষ করে তাঁর পূর্বসূরীদের সঙ্গে বিবেকানন্দের পার্থক্য কোথায় তা-ও এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে।

ভারতের সংস্কৃতি, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি, ধর্ম-চেতনা, সমাজ-চেতনা, গণ-চেতনা, —এগুলিতে বিবেকানন্দের অবদান ছিল অপরিসীম,—তাছাড়া, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, সমাজ দর্শন, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা, অর্থনৈতিক চিন্তা, সব ক্ষেত্রেই তাঁর চিন্তার মৌলিকতা আমাদের স্তম্ভিত করে। এই বইয়ে স্বামীজীর চিন্তাধারার শুধু একটি দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে, এবং সেটা হল তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা। বিবেকানন্দ অর্থনীতিবিদ ছিলেন না। অর্থশাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্ব নিয়েও তিনি মাথা ঘামাননি। তাঁর সমসাময়িক অর্থনীতিবিদদের দ্বারা যে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন তা-ও নয়। তবুও স্বামীজীর নিজস্ব একটি অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ছিল,—দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্টে, অভাবে ও অশিক্ষায় তাঁর প্রাণ কাঁদত বলেই এই চিন্তাধারা একটি নিজস্ব পথে প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁর চিন্তার মূল কথা হল—দেশের মানুষের জন্য ক্ষুধার অন্নের ব্যবস্থা করা, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, দেশকে স্বনির্ভরশীল করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং শ্রমজীবী মানুষকে তার ন্যায্য পাওনা ও অধিকার পেতে সাহায্য করা। দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন,—গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ব্যবসা সম্প্রসারণের ওপর এবং স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের ওপর। স্বামীজী নিজের মুক্তি বা রামকৃষ্ণ আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের মুক্তির কথা বলেন নি,—তিনি বলেছেন দেশের মানুষের মুক্তির কথা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা।

শ্রেণী-সংগ্রামের কথা তিনি বলেছেন,—কিন্তু তাঁর কাছে শ্রেণী-সংগ্রাম সম্ভাব্য হলেও অনিবার্য নয়। উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নজাতিকে শোষণ করা ও অবহেলা করাকে তিনি তীব্র কশাঘাত করেছেন এবং স্বপ্ন দেখেছেন একটি শোষণহীন সমাজের যার ভিত্তি হবে মানুষের সমানাধিকার। এজন্য বিপ্লবের কথাও তিনি বলেছেন, এবং এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার জন্য দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর সমাজতন্ত্রের মূল কথা, বিশেষাধিকারের বিলোপ এবং সমান অধিকারের প্রতিষ্ঠা। তাঁর এই সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মূল ভিত্তি অদ্বৈতবাদ ও বেদান্ত দর্শন—যেখানে সব মানুষই অমৃতের সন্তান, যেখানে দরিদ্র, মূর্খ, চণ্ডাল—সবার ভেতরেই নারায়ণ। রামকৃষ্ণদেবের প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দ শিবজ্ঞানে জীবে প্রেম করার কথা যেভাবে বলেছেন,—সেটাই তার সাম্যবাদের ভিত্তি। বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার এই বিশেষ দিকটি আমি আলোচনা করেছি। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। আমার এই আলোচনায় ত্রুটি থাকতে পারে,—কারণ বিবেকানন্দের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা লিখতে যাওয়া আমার পক্ষে পুরোপুরি সম্ভব নয়। তবুও যদি এই আলোচনার মাধ্যমে কিছু পরিমাণেও স্বামীজীর চিন্তা-কে পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে পেরে থাকি তবে সেটা ঠাকুরের কৃপা বলেই মনে করব।

এই বইটি লেখার প্রেরণা পেয়েছি বন্ধুবর অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং শ্রী নন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে কিছু লিখতে পেরেছি তার প্রেরণা কিছুটা পেয়েছি অধ্যাপক বসুর লেখা থেকে। এর জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। শ্রী নন্দ মুখোপাধ্যায় এই বইটি লেখার কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন; তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। তাছাড়া এই কাজে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন বন্ধুবর শ্রী অমল সেনগুপ্ত, সহকর্মী অধ্যাপক দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুজপ্রতিম শ্রী সহদেব সাহা। তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাইনা।
বইটির অসম্পূর্ণতা বা ভুল-ত্রুটি কারও চোখে পড়লে এবং আমার নজরে আনলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত

সুব্রত গুপ্ত

বিষয়সূচী

পটভূমিকা ১

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কৃষি উন্নয়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ২৮

ভারতে শিল্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ৩৮

শ্রমজীবীদের সম্পর্কে বিবেকানন্দ ৫৫

সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দ ৬৬

বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা ও সমাজচিন্তার সমন্বয় ৮৪

উপসংহার ৯৫

পটভূমিকা

বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে কী পরিবেশে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তখনকার দিনের চিন্তাবিদদের অর্থনৈতিক চিন্তা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায় থেকে সুরু করে অর্থনৈতিক চিন্তার একটি ধারা আমরা দেখতে পাই। এখানে মনে রাখা দরকার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৭৬) অ্যাডাম স্মিথের (১৭২৩-১৭৯০) "An Enquiry Into The Causes Of The Wealth Of Nations" বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে অর্থনীতি চর্চার একটি বৈজ্ঞানিক রূপ পরিলক্ষিত হয়। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মূলধন সঞ্চয়, শ্রম, শ্রমিকের নিয়োগ, শ্রম-বিভাগ, শিল্পের স্থানিকতা, উৎপাদনের বিশেষীকরণ, উৎপাদন ও বণ্টন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মূল্য-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা অ্যাডাম স্মিথের বইয়ে প্রথম দেখা যায়। অবশ্য সেই আলোচনা ছিল তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। ইংলণ্ডে তখন শিল্প-বিপ্লব সুরু হয়ে গেছে। অ্যাডাম স্মিথের উত্তরসূরী হিসাবে রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩) ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪) এবং পরে জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ের যে সব আলোচনা করেন সেগুলি উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিন্তাবিদদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়, দাদাভাই নওরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রমুখ চিন্তাবিদগণ অর্থনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রগুলিতেও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার সমস্যাগুলি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা চলে।

১৮১৮ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত সমাচার দর্পণে যে সব প্রবন্ধ

প্রকাশিত হয় তার একটি সার্থক সংকলন করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাচার দর্পণে আমরা দেখতে পাই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষে কলকাতাবাসী ওড়িয়ারা বছরে তিন লক্ষ টাকা দেশে পাঠাত। দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং-এর ব্যবস্থা প্রচলন করার প্রচেষ্টা প্রথম সুরু হয়েছিল শ্রীরামপুরে। ১৮২৬ সালে "Ganges River Insurance Company" স্থাপিত হয়েছিল নৌকাপথে ব্যবসায়িক পণ্য চলাচলের বীমার ব্যবস্থা করার জন্য। ব্রজেন্দ্রনাথের সংকলনে দেশের আর্থিক সমস্যা সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধ দেখা যায়; যেমন, "কৃষি-কর্মের বৃদ্ধি" "এতদ্দেশের বাণিজ্য," "ব্রহ্মদেশীয় বাণিজ্যদ্রব্য," "কোম্পানির লবণ মাসুলের পূর্ব বিবরণ," "ক্লোনাই জেসিয়ান—অর্থাৎ, ইঙ্গরেজ লোকের এদেশে চাষবাস বিষয়ক," "গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি," "চরকা কাটনির দরখাস্ত," "ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা" ইত্যাদি—; তাছাড়া ছিল মাঝে মাঝে আমদানি-রপ্তানির হিসাব, 'বাজার ভাও' এবং এমনকি কোম্পানির কাগজের প্রিমিয়ামের হার।[১] এই রচনাগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি তখনকার দিনে অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, ম্যালথাস প্রভৃতি অর্থবিজ্ঞানীদের রচনার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত লোকের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। কিন্তু দেশের আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন লোক যে দেশে ছিলেন না তা-নয়। সমাচার দর্পণ ছাড়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং সোমপ্রকাশ পত্রিকায়ও দেশের আর্থিক সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা হত।

"সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকা ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত মোট ৬০টি অর্থনৈতিক বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[২] তার মধ্যে ছিল ইউনিয়ন ব্যাংকের লোন ও ডিসকাউন্ট বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি, "শিল্পকার্য ও বাণিজ্য," "সুদ," "কৃষকদের সমস্যা," লবণ বাণিজ্য," "স্বর্ণমুদ্রা," "নীলকরদের অত্যাচার," "বঙ্গের কৃষকদের অবস্থা," "বাজেট," "বঙ্গীয় বাণিজ্য,"। ১৮৮১-১৮৯৭ সালে "বঙ্গবাসী" পত্রিকায়

বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে যে অভিমত ব্যক্ত হয়েছিল তা হল, ইংলণ্ডের শিল্প-গুলিকেসংরক্ষণ দিয়ে ভারতের শিল্প বাণিজ্যকে বিপর্যস্ত করা হয়েছে, অতিরিক্ত উচ্চ কর বসিয়ে কারুশিল্পীদের শোষণ করা হয়েছে ; তার ফলে হয়েছে ভয়াবহ দারিদ্র্য। তাছাড়া ভূমিরাজস্বের উচ্চ হার, ইউরোপীয় কর্মচারীদের বেশী বেতন, বস্ত্র শিল্পের উপর আমদানি কর বর্জনের অযৌক্তিকতা, শ্রম-আইন নিয়ে আলোচনা "বঙ্গবাসী" কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩] সুলভ সমাচারে (১ম খণ্ড, ১২শে অগ্রহায়ণ, ১২৭৭, ৪র্থ সংখ্যা) "শিল্প বিদ্যালয় ও কারিকরদের জন্য বিদ্যালয়" শীর্ষক সংবাদে স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান (Self employment), হাতের কাজ শেখার গুরুত্ব, এবং কারিগরদের জন্য কাজ শেখার ব্যবস্থা সম্পর্কে যে প্রতিবেদন বেরিয়েছিল তাতে তখনকার দিনের লোকেরা যে দেশের শ্রীবৃদ্ধির কথা ভাবতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী শিল্প বিদ্যা-লয়ে "ছুতোরের কার্য্য, সেলাই, ছবি আঁকা, ঘড়ি মেরামতি, এবং ছাপা কার্য্য নিয়মিত রূপ শেখান হইবে। যাঁহারা কেরাণীগিরি করিয়া দশ বার টাকার জন্য সমস্ত মাস পরিশ্রম করেন এবং অধীনতার যন্ত্রণা ভোগ করেন তাঁহারা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিবেন ভদ্রলোকেরা এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কেবল যে তাঁহাদের নিজের উপকার হইবে তাহা নহে,ঐ সকল ব্যবসায়েরও উন্নতি হইবে। তাঁহারা ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের নূতন ও ভাল প্রণালীতে ছুতরি সেলাই প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারিবেন। ইহাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?" সুলভ সমাচার প্রথম খণ্ডের ২য় সংখ্যায় "ভারতবাসীর প্রতি নিবেদন" কবিতায় আমরা দেখতে পাই ভারতে দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার জন্য মর্মবেদনা—

"মরি যে লজ্জায়
মুখ তোলা দায়
সবার অধম আমরা জগতে।

আমাদের ধনে
ধনী সর্বজনে,
বাঙ্গালী আমরা সোনার ভারতে ভাইরে।
পাঁচ জনে এসে
আমাদের দেশে
ধনমান লাভ করিছে কত
অলস হইয়ে
রয়েছি বসিয়ে,
আমরা কেবল উদাসীন-মত। ভাইরে।
... ...
যত সুখ ঘরে
অন্যে ভোগ করে
দেখিতেছি বসে আমরা কেবল।
নিজেদের ধন,
করনা গ্রহণ,
আপনার কাজ অপরে কি চলে।
ভাইরে।
পরের উপর
করিলে নির্ভর
এই দশা কভু ঘুচিবেনা আর।"

এই কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবধারা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী চিন্তানায়কদের গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল।

তখনকার সংবাদপত্রে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল অথবা সুলভ সমাচারে যে সব লেখা বেরোত তাতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি ছবি আংশিকভাবে আমরা দেখতে পাই। অর্থনৈতিক অব্যবস্থা সম্পর্কে সার্বিক বিশ্লেষণ উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা পাইনি বটে, কিন্তু তার মধ্যেই আমরা দেখতে পাই এক্ষেত্রে চিন্তানায়কদের উৎকণ্ঠা,—কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক

সংকট মোচন করা যায়, দারিদ্র্য দূর করা যায় অথবা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যায়,—এই উৎকণ্ঠার ভাগীদার হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষীকে আমরা দেখতে পাই, এবং তার সুরু হয়েছিল ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত বাস্তববাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যাগুলির সমাধানের কথা ভেবেছিলেন। অথচ, বিবেকানন্দ অর্থনীতিবিদ ছিলেন না। রাজা রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তা মূলতঃ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও কৃষিব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করে গড়ে উঠেছিল। রামমোহনের আমলে আমাদের দেশে কুটিরশিল্প ছিল অবনতির পথে; ততদিনে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। রামমোহন অবশ্য শিল্পোন্নয়নের চেয়েও জমিদারি ব্যবস্থায় কৃষকদের দুরবস্থার দিকে বেশী নজর দিয়েছিলেন। জমিদারদের নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কৃষকপ্রজার অনুকূলে তিনি নিজের বক্তব্য রেখেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদাররা পতিত জমিতে কৃষি উৎপাদনের সম্প্রসারণ করবেন, চাষের জমির উন্নতি করবেন, জমিদাররা রাজস্বের পরিমাণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবেন এবং ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিও রাজস্বের পরিমাণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত থাকবে,—এটাই আশা করা হয়েছিল।

জমিদাররা এবং কোম্পানি সরকার রাজস্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলেও কৃষকদের অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হয়নি, রামমোহনের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। জমি চাষ করে উৎপন্ন আয়ের পর্যাপ্ত অংশ লাভে কৃষকের অধিকার থাকবে এটা তিনি মেনে নিয়েছিলেন। রামমোহন বলেছিলেন, "আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনা, যে অধিকার জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল, সে রকম অধিকার প্রজারা কেন পাবেনা, তাদের দেয়া খাজনা স্থায়ীভাবে স্থিরীকৃত হবেনা কেন, কেনই বা সহৃদয় সরকার এখনো রায়তের খাজনা বর্তমানে প্রদত্ত পরিমাণ অনুসারে স্থির করে দেবেন না, কেন ভবিষ্যতে খাজনা বৃদ্ধি শক্ত হাতে নিষিদ্ধ করা হবেনা।"[৪] প্রজাদের যদি জমির উন্নয়নের দরুণ কিছু সুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে সরকারের রাজস্ব কমে যেতে পারে,—এই আশংকার

পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনের অভিমত ছিল : (১) বিলাস সামগ্রীর ওপর এবং অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন সব জিনিসের উপর অধিক কর আরোপ ; (২) রাজস্ব বিভাগের ব্যয় সংকোচন। হাজার দেড় হাজার টাকার বেতনের ইউরোপীয় কালেক্টরের পরিবর্তে তিন চারশো টাকার বেতনে ভারতীয় কালেক্টর নিয়োগ হওয়া বাঞ্ছনায় ; (৩) প্রজাদের খাজনা কমে গেলে তারা সন্তুষ্ট থাকবে এবং ফলে সরকারের প্রশাসনিক নৈপুণ্য বাড়বে ; (৪) ব্যয়-বহুল স্থায়ী সেনাবাহিনীর পরিবর্তে স্থানিক রক্ষীদলের ব্যবস্থা হলে ব্যয়-সংকোচ ছাড়াও জনসাধারণের সাহচর্য ও আনুগত্য বেড়ে যাবে।[৫]

যদিও রামমোহন কৃষক প্রজাদের অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে সহানুভূতিশীল ছিলেন তবুও তিনি জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের পক্ষে ছিলেন না। তিনি জমিদারের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাক তাও চাইতেন। সম্পন্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর আস্তত্বের গুরুত্বও তিনি স্বীকাব করতেন। রায়তওয়ারি ব্যবস্থা থেকে জমিদারী ব্যবস্থাই তার কাছে অধিকতর কাম্য ছিল।[৬] বিলাস-সামগ্রীর উপর করধার্য করার পক্ষেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

রামমোহন উপনিবেশ স্থাপন বা কলোনাইজেসনের (Colonisation) একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন। এই নীতির ভিত্তিতেই তিনি বিশ্বাস করতেন, কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের পরিবর্তে যদি বেশীসংখ্যক ইউরোপীয় এসে এদেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য অংশ গ্রহণ করে তবেই দেশের ব্যাপক

৬। "The Raja was in favour of maintaining a prosperous middle class in the country. So he preferred the Zamindary to the Ryotwari settlement. He held that under the former at least one class of people could attain to prosperity, but under the latter system everyone remained wretched."

"History of Indian Social and Political Ideas : Biman Bihari Majumdar, From Rammohan to Dayananda (1957) P. 43.

অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। ইংলণ্ডে সিলেক্ট কমিটির কাছে সাক্ষাদানকালে রামমোহন এদেশ থেকে কী বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংলণ্ডে নিঃসারিত হয়ে যায় তারও একটি বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন। রামমোহন আইনের চোখে সকলেই সমান এটা বিশ্বাস করতেন; আইনের শাসনও তিনি চাইতেন: অথচ ইংরেজ শাসনকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। রামমোহন ইউরোপীয়ান সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার দ্বারাও প্রভাবিত হননি অথবা ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির চিন্তাধারার দ্বারাও প্রভাবিত হননি। রাজা রামমোহনের লেখায় আমরা অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো এবং ম্যালথাসের লেখার কোন উল্লেখ পাইনা। তবুও এটি অনস্বীকার্য যে রামমোহনই প্রথম ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নিজেব মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি স্বামীজীর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। সমাজ সংস্কারক রামমোহন যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন। রামমোহন সম্পর্কে তাঁর উক্তি—"The first man of new regencrate India"—গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন।[৭] তবে স্বামীজী সর্বাংশে রামমোহনের অনুগামী ছিলেন না।

এই প্রসঙ্গে আমরা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখ করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধু বাংলা উপন্যাসের জনক-ই নন। সমাজ-চিন্তা, দেশের স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা, দর্শন, ধর্ম-চিন্তা এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ সর্বক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রেব অবদান অপরিসাম।

"বঙ্গদেশের কৃষক" শীর্ষক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার একটি পরিচয় আমরা পাই। "দেশের শ্রীবৃদ্ধি" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হয়েছে ছুটি কারণে, প্রথম, "কর্ষিত ভূমিব আধিক্যে" এবং দ্বিতীয়, "ফসলের মূল্যবৃদ্ধিতে"। সেই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন করেছেন, "এই বেশী টাকাটা কার ঘরে যায়? কে লইতেছে"? উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদিত সামগ্রী বা বর্ধিত আয়ের বণ্টন সমস্যা যে জড়িত, বঙ্কিমচন্দ্র সেটিই দেখাতে চেয়েছেন এবং বলেছেন,"এ ধন কৃষিজাত—কৃষকেরই প্রাপ্য—বাস্তবিক

৭। Swami Vivekananda : Patriot Prophet. by Dr. B. N. Dutta.

তাহারা পায় না।" বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ...অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয়শত নিবানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয়গান করিব না।" চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ কৃষকদের দুরবস্থার যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র এ কেছেন, বিশেষ করে মহাজনদের জুলুম এবং কৃষকদের দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দাসত্বের যে করুণ চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনীতে আমরা দেখতে পাই,—অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ গঠনে তার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া "কমলাকান্তেব দপ্তরে" আমরা দেখতে পাই সমাজ-সচেতন বঙ্কিমচন্দ্রকে যিনি সমাজে অর্থনৈতিক শক্তির সমবণ্টন সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী। শ্রমোপজীবী এবং বুদ্ধ্যপজীবীর পার্থক্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের "সাম্য" বইটি তাঁর অর্থনৈতিক সচেতনতার অপূর্ব নিদর্শন। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় "সোস্যালিষ্টিক" কথাটির উল্লেখ আছে, বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ কার্লমার্কস দ্বারা প্রভাবিত হননি। 'সাম্য' বইটি বঙ্কিমচন্দ্র পরে প্রত্যাহার করেছিলেন—তার মধ্যে উগ্র পাশ্চাত্য মত ছিল বলে। তবে ভারতে সাম্য বিষয়ে এটিই ছিল প্রথম বই।

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার বীজ রোপিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর আশীর দশকে। যদি বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বিবেকানন্দকে প্রভাবিত করেছিল তবে হয়ত তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কৃষক যদি জমির মালিকানা না পায়—তাহলে কৃষির উন্নতি ঘটতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দও দেশে কৃষি পরিকল্পনার কথা ভেবেছিলেন। গরীব চাষীদের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদত। কিভাবে দেশের কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করা যায় এবং কিভাবে তাদের দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে একটি সুস্থ, সবল জীবনযাত্রার সামিল করা যায়, স্বামীজীর এটি ছিল অন্যতম চিন্তা।

রাজা রামমোহন রায়ের পর ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে যাঁরা উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে দাদাভাই নওরোজী (১৮২৫-১৯১৭)

মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১) এবং রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) উল্লেখযোগ্য। দাদাভাই নওরোজী ছিলেন "ড্রেন থিয়োরী"-র (Drain Theory) প্রধান প্রবক্তা। অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর প্রধান বই ছিল "Poverty and Un Britrish Rule in India." নওরোজীর মতবাদের তিনটি বিশেষ ধারা হল (১) ভারতীয়দের দারিদ্র্য এবং সেই দারিদ্র্য মোচন করার ক্ষেত্রে সরকারী প্রয়াসের অভাব (২) সরকারের ব্যয় বাহুল্য এবং সেই সঙ্গে গরীব জনগণের উপর করের বোঝা চাপানো এবং (৩) ভারত থেকে ব্রিটেনে একতরফা ভাবে সম্পদ নির্গমন বা রপ্তানি যা "ড্রেন থিয়োরী" নামে পরিচিত। ভারতীয়দের দারিদ্র্য নিয়ে আলোচনায় দাদাভাই নওরোজী যেভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে সেটি বিস্ময়কর, অবশ্য বর্তমানকালের বিচারে এ-ধরণের তথ্য সংগ্রহে অসম্পূর্ণতা থাকাই স্বাভাবিক। ১৮৭০ সালে নওরোজীর হিসাব অনুযায়ী ১৫ কোটি জনসংখ্যার মোট জাতীয় আয় ছিল ৩০০ কোটি টাকা এবং মাথা পিছু বাৎসরিক আয় ২০ টাকা। বোম্বাই, আহামদাবাদ, পুনা প্রভৃতি শহরের শ্রমিকদের জীবন-ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রযোজন কত, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে দারিদ্র্যের গভীরতা বিচার করার চেষ্টা নওরোজী করেছিলেন। তখনকার দিনে এমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য ছিলনা যা দিয়ে দেশের অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীর ভোগ্যবস্তুর ব্যবহারের তারতম্য সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যায়। তবুও বর্তমানে যেখানে দারিদ্র্য সীমা নিয়ে ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে সেখানে একশত বছর আগে দাদাভাই নোওরজী যে আলোচনা করে গেছেন তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দারিদ্র্য সম্পর্কিত আলোচনা থেকে নোওরজীর "ড্রেন থিয়োরী" সম্পর্কিত আলোচনায় আসা যায়। রাজা রামমোহন রায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক ব্যয়-বাহুল্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ভারত থেকে বিদেশে "Home Charges" বাবদ যে টাকা চলে যেত সে সম্পর্কে নওরোজী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ভারতীয়দের কাছ থেকে যেরাজস্ব আদায় হত তার একটি বড় অংশ খরচ করা হত ইংরেজ প্রশাসকদের বেতন ও পেন্সন দেওয়ার জন্য অথবা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বিলাত থেকে কিনে আমার জন্য। ইংরাজরা এদেশে যে টাকা খরচ করত

তা ভারতীয়দের কাছ থেকেই আদায় করত এবং আদায়ীকৃত রাজস্ব ইংলণ্ডের রাজকোষে যেত। ভারতের জন্য ইংলণ্ডে যে প্রশাসনিক খরচ হত তাও ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের কাছ থেকেই আদায় করত। এগুলিকে বলা হত "Home Charge,"—এবং এর মাধ্যমেই ভারতের সম্পদ বিদেশে চলে যেত। তাছাড়া নওরোজী বাণিজ্যিক বিনিময় হার এবং ভারতের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের প্রকৃতি (Terms of Trade) সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ বেশী ছিল। নীচের তালিকায় আমরা তা দেখতে পাই।[৮]

বাৎসরিক গড়	আমদানি (লক্ষ টাকা)	রপ্তানি লক্ষ টাকা)
১৮৩৪-৩৫ থেকে ১৮৩৮-৩৯	৭˙১৩	১১˙২৩
১৮৫৯-৬০ থেকে ১৮৬৩-৬৪	৪১˙০৬	৪৩˙১০
১৮৮৯-৯০ থেকে ১৮৯৩-৯৪	৮৮˙৭০	১০৮˙৬৭
১৮৯৯-১৯০০ থেকে ১৯০৩-০৪	১১০˙৬৯	১৩৭˙৬৯

তখন রপ্তানি থেকে যে আয় ভারতের হত তার যথাযথ ব্যবহার হয়নি অথবা তার বিনিময়ে ভারত আমদানি পায়নি। উদ্বৃত্ত আয়ের অধিকাংশই ব্যয় করতে হত ইংলণ্ড থেকে নেওয়া ঋণের ওপর সুদ দিতে বা ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন ও পেন্সন গুণতে। নওরোজী যে সব প্রশ্ন তুলেছিলেন সেগুলি হল, ইংলণ্ড থেকে চড়া দামে যে-সব সরঞ্জাম কেনা হত (বিশেষ করে রেলপথের জন্য) তার সবটাই প্রয়োজন অনুযায়ী ছিল কিনা অথবা সেটা আরও কম দামে কেনা যেত কিনা, বিদেশী কর্মচারীর সংখ্যা আরও কমানো যেত কিনা অথবা তাঁদের জন্য প্রদেয় বেতন বা পেন্সনের পরিমাণ আরও কমানো যেত কিনা। মূলধন সামগ্রীর মধ্যে আমদানির বিকল্প যে-সব জিনিসের উৎপাদন করা সম্ভব (অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে আমরা import-substitutes বলতে

৮। Imperial Gazetteers. Vol III (1908). Quoted in "The Rise and Growth of Economic Nationalism In India." Bipan Chandra, P. 143.

পারি) সেগুলির উৎপাদন বাড়াবার দিকে সরকার তখন নজর দেননি। যে টাকাটা ইংরেজ ব্যবসায়ী ভাবতে মুনাফা হিসাবে উপার্জন করে বিদেশে পাঠাত সেগুলি বাদ দিয়েও নওরোজীর হিসাব অনুযায়ী ভারত থেকে ইংলণ্ডে এক তরফা নির্গমনের পরিমাণ ছিল ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত গড়ে বছরে পাঁচ কোটি টাকা। সেটা বেড়ে ১৮৭০ থেকে ১৮৭১-এ হয়েছিল বছরে ২৭ কোটি টাকারও বেশি।[৯]

ভারতীয়দের দারিদ্র্য নিয়ে নওরোজীর আলোচনা এবং তাঁর "ড্রেন থিয়োরী" বিবেকানন্দের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। যদিও স্বামীজীর উক্তিতে নওরোজীর উল্লেখ নেই, কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নওরোজীর বিশ্লেষণ এবং বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মধ্যে যোগসূত্র আমরা দেখতে পাই। স্বামীজীর ভাষায় "ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য রাজস্ব--সমস্তই, তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত।...একথা ইউরোপীয়েরা স্বীকার করতে চায়না, ভারত নেটিভপূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন, সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতেও চায়না, বুঝতেও চায়না।"[১০] বিবেকানন্দ এক জায়গায় লিখেছেন, "গড়ে ভারত বাসীর মাসিক আয় ২ টাকা।" আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "তাদের গড় আয় মাসিক পাঁচসিকে কি দেড় টাকা।"[১১] দাদাভাই নওরোজীর হিসাবে ১৮৭০ সালে ভারতীয়দের মাসিক গড় আয় দেড় টাকা। স্বাভাবিক-ভাবে মনে করা যেতে পারে স্বামীজী নওরোজীর জাতীয় আয় পরিমাপ করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ভারতের ভয়াবহ দারিদ্র্যের মূলকারণ হিসাবে স্বামীজী দুটি জিনিসের উল্লেখ করেছেন। এক, ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ এবং দুই, অভিজাত, জমিদার ও পুরোহিতদের অকথ্য অত্যাচার ও শোষণ। ইংরেজরা যে ভারতের জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করে দেশকে দারিদ্র্যের

৯। "অর্থনীতির পথে"—ভবতোষ দত্ত।
পৃষ্ঠা ৩৩

১০। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রথম সংস্করণ পৃঃ ১০৬

১১। ঐ।

অভিশাপে জর্জবিত করেছে, স্বামিজী এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। এক্ষেত্রে দাদাভাই নওরোজী ও রমেশচন্দ্র দত্তের চিন্তাধারার সঙ্গে স্বামীজীর একাত্মতা আমরা দেখতে পাই। ভাবতে দারিদ্র্যের যে দুঃসহ রূপ স্বামীজীর লেখনীতে আমরা দেখতে পাই; সেটি শুধু একজন মানবদরদীর কান্নাই নয়,—সেটি একজন বাস্তববাদী চিন্তাবিদের অর্থনৈতিক চিন্তার প্রতিচ্ছবিও বটে। এক্ষেত্রে স্বামীজীব উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"ইংরেজ ভারতের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। তা না হলে ভারতে তার বর্তমান জনসংখ্যার পাঁচগুণ লোকের ভরণপোষণের উপযোগী উৎপাদন ও জীবিকার সংস্থান রয়েছে। ইংরেজ শাসনের ফলে ভারত এখন কোনো রাজ-নৈতিক শক্তি নয়, দাসত্বের শিকল-পরা একটি জাতি। শাসনকার্যে ভারতবাসীর কোনো হাত নেই। তাদের গড় আয় মাসিক পাঁচসিকে কি দেড় টাকা। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলের মানুষেরা মাসের পর মাস, বছবের পর বছর, মহুয়া ফুল সেদ্ধ করে খেয়ে জীবন ধারণ করে। কোথাও কোথাও পরিবারের জোয়ান পুরুষেরাই কেবল ভাত খায়, নারী ও শিশুরা ফেন খেয়ে থাকে। ভারতের অধিকাংশ লোক সম্বন্ধে বলা যায়—মোটামুটি অনাহারই তাদের সাধারণ অবস্থা। আয়েব একটু হেরফের হলেই লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু। ইংরেজ শাসনে ভারত শুধু মানুষের ধ্বংসস্তূপ।......ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে থেঁতলেছে, নিজেদের সুখের প্রয়োজনে আমাদেব শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত চুষে খেয়েছে, লুঠে নিয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা। আব তার ফলে পড়ে রয়েছে শ্মশানের মত আমাদের দেশ।"[১২]

দাদাভাই নওরোজীব পর যে ভারতীয় চিন্তাবিদ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন তিনি হলেন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। তাঁকে "ভারতীয় অর্থনীতি" সম্পর্কিত চিন্তাধারার পথিকৃৎ বলা যায়। তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের নাম-ই ছিল "ভারতীয় অর্থনীতি"। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন যে তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে সংঘাত থাকলে ভারতীয়

অর্থনীতির আলোচনা একটি নিছক অলস স্বপ্নে পর্যবসিত হবে। আপেক্ষিকতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি আলোচনা করতে হবে।[১৩] রাণাডে বিশ্বাস করতেন, সরকারী তত্ত্বাবধান ও সাহায্যে দেশের মোট সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। রাণাডে চেয়েছিলেন "রাষ্ট্রীয় অভিভাবকত্বে বক্তি-প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা"। তাঁর মতে সরকারী সাহায্যে (সরকারী মালিকানার নয়) স্বল্পায়তন কৃষিক্ষেত্র বৃহদায়তন কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে, কৃষির অনুপাতে যন্ত্রশিল্পের প্রাধান্য বাড়তে পারে, গ্রামের লোক জীবিকার আশায় শহরে আসতে পারে,[১৪] এবং গ্রামকে যথাসম্ভব শহরে রূপান্তরিত (urbanisation) করা যেতে পারে। আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়ে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে এবং ভারতীয় শ্রমিকদের বিদেশে যাবার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে। রাণাডে মনে করতেন, এভাবে দেশের সম্পদ বাড়ানো সম্ভব হবে। তবে সম্পদ বেড়ে যাবার পর তার বণ্টন কিভাবে হবে সে সম্পর্কে রাণাডে বিশেষ কিছু বলেননি। ভারতে যন্ত্র শিল্পের উন্নতির জন্য রাণাডে সরকার কর্তৃক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, গ্যারান্টি বা অর্থ সাহায্য করে নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা করা, শ্রমিকদের চলাচলের সুবিধা করা, কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। রাণাডে যদিও জার্মান লেখক ফ্রেডরিক লিস্ট্ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি লিস্টের শিল্প সংরক্ষণ নীতির খুব একটা সমর্থক ছিলেন না। তবে ১৮৯৯ সালের মে ও জুন মাসে "ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স" ছদ্মনাম ব্যবহার করে বিদেশী চিনির ওপর কর বসিয়ে দেশের চিনি শিল্পকে সাহায্য করার কথা রাণাডে বলেছিলেন।[১৫]

স্বামীজী সে রাণাডে-র দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন মনে হয় না। তবে যে রাজনৈতিক সচেতনতায় জাগ্রত হয়ে রাণাডে এবং তৎকালীন লেখকগণ

অর্থনৈতিক নীতি বা আদর্শের কথা বলতেন তাতে যে স্বামীজীর প্রভাব ছিল সন্দেহ নেই। রাণাডেব গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে,— তখন স্বামীজী দেশের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং ভারতের যুব-সমাজও তাঁর অগ্নিগর্ভ বাণী ও লেখা থেকে প্রেরণা পেতে আরম্ভ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংশে আরেকজন বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক চিন্তা-ধারার কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। রমেশচন্দ্র মূলতঃ ছিলেন অর্থনৈতিক ইতিহাসের লেখক এবং ভারতের অর্থ-নৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁকে পুরোধা বলা চলে। রমেশচন্দ্রের Economic History of India বইটি দুটি খণ্ডে যথাক্রমে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত এবং ১৮৩৭ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত ভারতের দেড়শ বছরের অর্থনৈতিক অবস্থার নিখুঁত বিবরণ। বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে যে বছর স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে, স্বামীজীর দেহত্যাগের দুই বছর পর। সুতরাং বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে রমেশচন্দ্রের বইয়ের যোগসূত্র নেই। কিন্তু, রমেশচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার যে বিবরণ দিয়ে গেছেন, বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্রে সেই অর্থনৈতিক অবস্থার যোগসূত্র আছে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

রমেশচন্দ্র ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনায় তিনটি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। প্রথম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের প্রভূত উন্নতি ও সমৃদ্ধি হয়েছিল এবং যেসব প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়নি তাদের দুর্দশার অন্ত ছিলনা। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রমেশচন্দ্র মতপার্থক্য লক্ষনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র দেশের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের দুর্দশা, বিশেষ করে তাদের দারিদ্র্য, মুর্খতা ও দাসত্বের কথা বলেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কিছু গুণ অবশ্যই ছিল। কিন্তু তার দোষগুলি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেননি; যদি তিনি সেটি করতেন তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

বিকল্প কোনো পন্থার মাধ্যমে কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব কিনা তার পথ নির্দেশ করতেন। রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এবং তৃতীয় সিদ্ধান্ত ছিল এদেশে ইংরাজ শাসনের তীব্র সমালোচনা। তখনকার দিনে একজন আই. সি. এম. অফিসারের পক্ষে এ-ধরণের নির্ভীক আলোচনা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি ছিল, ভারতবর্ষের সরকারী ঋণের বোঝা অন্যায় ভাবে এই দেশের ওপর চাপানো হয়েছিল এবং তৃতীয় সিদ্ধান্তটি ছিল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি. ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং ভারতে কর্মরত ইংরেজ শাসকগণ এদেশে নিজেদের ব্যবসায়ের দিকে এত বেশী নজর দিয়েছিলেন যে তার ফলে ভারতীয় শিল্পের দুর্দশা যে বেড়ে যাচ্ছিল এবং এদেশে যে শিল্পায়নের পথ রুদ্ধ হচ্ছিল সেদিকে তাঁরা তাকাননি। এক্ষেত্রে দাদাভাই নওরোজীর "ড্রেন থিয়োরী" এবং রমেশচন্দ্রের সিদ্ধান্তের মধ্যে সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষনীয়। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশের স্বাধীন চিন্তাবিদগণ সবাই এ-ব্যাপারে একমত ছিলেন যে ইংরেজরা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মাথা ঘামাতেননা। কারণ ভারতবর্ষ যদি শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে যায় তবে এদেশে ইংলণ্ডে উৎপাদিত সামগ্রীর বাজার নষ্ট হবে। স্বামী বিবেকানন্দও এই ধরণের অভিমত পোষণ করতেন।

দাদাভাই নওরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে এবং রমেশচন্দ্র দত্ত বহু পরিশ্রম করে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে প্রামাণ্য বই ও প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক চিত্র তৎকালীন *সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় যে যথেষ্ট পরিবেশিত হয়েছিল* তা-ও মনে রাখতে হবে। এ সম্পর্কে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

এখন দেখা যাক, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের শিল্প-কাঠামোর চেহারা কেমন ছিল। ভারতবর্ষ তখন যে শুধু একটি খুবই অনুন্নত দেশ ছিল, তা নয়; এই অনুন্নত অর্থনীতি ছিল ব্রিটিশ অর্থনীতির একটি বিরাট উপনিবেশ, —ইংলণ্ডে উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য একটি তৈরী বাজার। ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের সুফল পুরোপুরিভাবে পাওয়া যেতনা যদি ইংরেজদের হাতে ভারতের মত আরও বহু উপনিবেশ না থাকত। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় (১৮০৬

সালে) Bank of Bengal স্থাপিত হয়। পরে স্থাপিত হয় বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ব্যাংক এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ব্যাংক। এই ব্যাংকগুলিই পরবর্তীকালে Imperial Bank of India-য় রূপান্তরিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকটি ছোট ছোট ব্যাংকও গঠিত হয়েছিল ; নীল রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাবার পর সেগুলির মধ্যে অনেকেই ব্যবসা বন্ধ করে দেয়।[১৬] পাট শিল্পের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে। প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয় পঞ্চাশের দশকে। ১৮৫২ সালে প্রথম রেলপথ খোলা হল বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত ; তার তিন বছর বাদে রেলপথ খোলা হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত। ধীরে ধীরে রেলপথ বিস্তৃত হতে লাগল। রেলপথের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভিতর ব্যবসা-বাণিজ্যর সম্প্রসারণ হতে লাগল। ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হল কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবার সুরু থেকেই বাংলায় নবজাগরণের সূচনা হল। মনে রাখতে হবে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ছিল ভারতে নবজাগরণ ও নবচেতনার পথিকৃৎ। দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনা এই প্রদেশেই প্রথম ব্যাপকভাবে সুরু হয়। ষাটের দশকে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের সূচনা হল। এদিকে ১৮৩৫ সাল থেকেই সারা দেশে একই ধরণের মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ১৮৭০ সালের পরথেকে রূপার দাম কমতে আরম্ভ করল এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুদ্রানীতি সম্পর্কেও সরকারী নীতি তৈরী হল।

দেশের এই অর্থনৈতিক পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দের কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু যে মহাপুরুষের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে বসেছি তিনি ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী নিজের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পেরেছিলেন বলেই দেশের মানুষের দুঃখ বুঝতে পেরেছিলেন। শিবজ্ঞানে জীবসেবার ধর্ম তিনি বেছে নিয়েছিলেন বলেই নিজের মুক্তির চেয়েও দেশের লোকের মুক্তি তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছিল।

স্বামীজী অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন না বটে, কিন্তু জন স্টুয়ার্ট মিলের

১৬। অর্থনীতির পথে—ভবতোষ দত্ত। পৃঃ ৫।

রচনাবলী তাঁর ভালভাবে পড়া ছিল এবং মিল তখন ছিলেন পৃথিবীর অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অগ্রণী। অর্থনীতি সম্পর্কেও তাঁর যে সুগভীর জ্ঞান ছিল এই মতের সমর্থন মেলে এরিক হ্যামণ্ডের উক্তির মধ্যে। তিনি লিখেছেন "Swamiji soon showed that he was equally versed in History and Political Economy. He stood among these people on their own ground."১৭

১৮৯১ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর (ঠিক ধর্ম মহাসম্মেলনের আগে) American Social Science Association-এর সভায় স্বামীজী "Use of Silver in India" শীর্ষক বক্তৃতা দিয়েছিলেন আমেরিকার দৈনিক পত্রিকা "Daily Saratogian" "Money was the Subject" শিরোনামায় মন্তব্য করেন :

"At the conclusion of the reading (of Papers) Vivekananda, the Hindoo monk addressed the audience in an intelligent and interesting manner, taking for his subject the use of silver in India."১৮ অর্থশাস্ত্র এবং মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে স্বামীজীর পক্ষে এই বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হত না; স্বামীজী পরিব্রাজক হিসাবে দেশের সর্বত্র ঘুরেছেন। তখনই তিনি দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের খুব কাছের মানুষ হয়েছেন। পরবর্তী কালেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি যখন দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের সম্পর্কে নানা ধরনের উক্তি করেছেন,—যেগুলি সবই তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চয় করা হয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতা "The Master As I Saw Him" বইয়ে স্বামীজীর ভ্রমণসঙ্গী হিসাবে স্মৃতিচারণা করে বলেছেন, "...Perhaps nowhere did his Love seem... more intense, than as we passed across the long stretches of the Plains covered with fields and farms

and villages. There his thought was free to brood over the land as a whole and he would spend hours explaining the communal system of agriculture, or describing the daily life of the farm house —It was the memory, doubt less, of his own days as a wanderer, that so brightened his eyes and thrilled in his voice, as he told us these things-"[১১] পরিব্রাজক হিসাবে স্বামীজী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ প্রত্যক্ষ করেছেন, দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সাধারণ গরীব মানুষের অসীম দুর্গতি স্বামীজীকে আকুল করেছিল। দেশের লোকের উপর ব্রিটিশ সরকারের আরোপিত গুরুভার করের বোঝা, একান্ত অনগ্রসর কৃষি-ব্যবস্থা, জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারে প্রপীড়িত গরীব কৃষকদের দুরবস্থা, দেশে শিল্পোন্নয়নের পথে বিভিন্ন বাধা,—সব কিছু মিলিয়ে দেখলেই দেশের আর্থিক সমস্যার চিত্র পাওয়া যায়। এই জিনিসটি স্বামীজীকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। স্বামীজীর শিবজ্ঞানে জীবসেবার মন্ত্র এবং জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার মুক্তির জন্য যে উদাত্ত আহ্বান আমরা দেখতে পাই তার পেছনে ছিল এই সুগভীর মানবপ্রেম। ঠাকুর রামকৃষ্ণের উক্তি "খালি পেটে ধর্ম হয়না" স্বামীজী অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করতেন। সেজন্যই স্বামীজী বলতে পেরেছিলেন, "যে পর্যন্ত আমার দেশের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, সে পর্যন্ত তাকে আহার দেওয়াই আমার ধর্ম।"

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য চিন্তাবিদদের থেকে স্বামীজীর স্বাতন্ত্র্য হল এই যে—তিনি যা কিছু বলে গেছেন তার সব কিছুই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ জ্ঞান; পুঁথিগত তথ্যের ওপর তিনি নির্ভর করেননি। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা দেশের সমস্যার সমাধানে কতটা কাজে লেগেছে অথবা লাগানো হয়েছে তা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির কথা ভেবেছেন এবং কিভাবে সমস্যাগুলির মোকাবিলা করা যেতে পারে যে সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই উপায় নির্দেশ করেছেন। তাঁর নির্দেশিত পথ এখনকার পরিপ্রেক্ষিতেও যথেষ্ট মূল্যবান। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে ভারতকে তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করতে

.১১। The Master As I Saw Him—Sister Nivedita P. 88-9.

হবে : বিদেশের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবেনা। 'আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সংস্থাগুলি জোর করিয়া আমাদিগকে যে প্রণালীতে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা বৃথা ; উহা অসম্ভব।"[২০] ভারতের দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রমজীবীদের সমস্যা তিনি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন —সেই সঙ্গে কিভাবে দেশকে কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ করা যায় সেই চিন্তাও করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছিলেন তার প্রভাবেই তিনি দেশোদ্ধারের মন্ত্র যুবক সম্প্রদায়কে দিয়েছিলেন। শিক্ষার অভাব, অন্নবস্ত্রের অভাব, শ্রমজীবীদের মর্যাদার অভাব, প্রভৃতি সব সমস্যার সঙ্গেই যে দেশের অর্থনৈতিক জীবন জড়িত, স্বামীজী এটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর এই উপলব্ধি তাঁর অপার মানব প্রেমেরই একটি বিশেষ দিক. সাধারণ অর্থনীতিবিদের দৃষ্টি থেকে এর বিশ্লেষণ করলে সেই বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে

ভারতীয়দের মধ্যে বিবেকানন্দই প্রথম নিজেকে সমাজতন্ত্রী (socialist) বলেছিলেন।[২১] এই সমাজতন্ত্র অবশ্যই মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর মুখে সমাজতন্ত্রের কথা শোনা বিস্ময়কর তবুও স্বামীজীর মুখেই একথা প্রথম শোনা গিয়েছিল। পৃথিবীতে শ্রেণী-শাসন ও শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ইতিহাস নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সঙ্গে যে সামাজিক সমস্যাগুলি জড়িত,—দেশের লোকের শিক্ষার অভাব, জড়তা ও উদ্যোগের অভাব প্রভৃতি যা দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে স্বামী বিবেকানন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

২০. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পঞ্চম খণ্ড ১০৯ পৃঃ।

২১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পৃঃ ৩০২

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কৃষির উন্নয়ন প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

দারিদ্র্য সম্পর্কে বিবেকানন্দের বিশ্লেষণ নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ। ভারতের ভয়াবহ দারিদ্র্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ দুটি জিনিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন: এক, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ এবং দুই, গরীব চাষী, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের উপর অভিজাত, জমিদার ও পুরোহিতদের অত্যাচার ও শোষণ।

ইংরেজ শাসনের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন: "ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে থেতলেছে, নিজেদের সুখের প্রয়োজনে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত চুষে খেয়েছে, লুটে নিয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা, আর তার ফলে পড়ে রয়েছে শ্মশানের মত আমাদের দেশ।"[১] দাদাভাই নওরোজীর "ড্রেন থিয়োরী"র তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এই উক্তিতে নেই বটে,—কিন্তু একটি নির্মম সত্য প্রতিভাত হয়েছে স্বামীজীর এই কথায়। স্বামীজী এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "ইংরেজ শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড এদেশে ঘটেছে এবং তার চেয়েও ভয়ানক যে-সকল দুর্ভিক্ষ পরে দেখা দিয়েছে, তা গ্রাস করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন।"[২] দারিদ্র্য-সীমা (Poverty line) বলে একটি কথা আজকাল খুবই প্রচলিত। বিশেষ করে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে মোট জনসমষ্টির ৪২ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে আছে না ৫২ শতাংশ নীচে আছে,—এ নিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত-পার্থক্য আছে। কিন্তু, দারিদ্র্য-সীমার মাপকাঠি কী হবে উনবিংশ শতাব্দীতে তা বলা সম্ভব ছিল না। দাদাভাই নওরোজী একজন ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক আয় (১৮৭০ সালের ভিত্তিতে) ধরেছিলেন ২০ টাকা। বিবেকানন্দও বলেছেন তাঁর সময়ে ভারতবাসীর গড়

১। জনগণের অধিকার,—পৃঃ ২৩

২। — " —পৃঃ ২১

আয় "মাসিক পাঁচসিকে কি দেড়টাকা।" তখন বহুক্ষেত্রে দেশের লোক ছিল অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত। স্বামীজীর ভাষায় "ভারতের অধিকাংশ লোক সম্বন্ধে বলা যায়—মোটামুটি অনাহারই তাদের সাধারণ অবস্থা। আয়ের একটু হেরফের হলেই লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু।" ভারতে উনবিংশ শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষের যে করুণ অভিজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়েছিল তার কারণ হিসাবে অজন্মা, খরা বা বন্যা সব-ই ছিল, কিন্তু তার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ইংরেজদের অনুসৃত নীতি। রমেশচন্দ্র দত্ত অবশ্য এই জিনিসটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যদিও তাঁর মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়েছিল। তবে একথা ভুললে চলবে না যে কৃষির উৎপাদনী শক্তি বাড়ানোর জন্য কোন সক্রিয় প্রচেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীতে হয়নি। জলসেচ ব্যবস্থার অভাব, ভাল বীজ ও সরবরাহের অভাব এগুলি তো ছিলই,—এগুলি যে শুধু উনবিংশ শতাব্দীতেই ছিল তা নয়,—বিংশ শতাব্দীতেও স্বাধীনতার আগে কৃষির উন্নতির জন্য কোনও সক্রিয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। অর্থনীতিবিদ রসটোর (Rostow) ভাষায় উনবিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাকে 'Stagnant Economy' বা অনড় অনুন্নত অর্থনীতি বলা যায়। এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল দেশের অর্থনীতির প্রতি সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অবহেলার দরুণ। স্বামীজীর জীবিতকালে পাশ্চাত্য দেশে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল,—কিন্তু যে প্রযুক্তি-বিদ্যার সাহায্যে পাশ্চাত্য দেশে কৃষির উন্নতি সম্ভব হয়েছিল ভারতে তা না হবার কারণ ছিল ইংরেজ শাসকদের অবহেলা ও শোষণ করার প্রবৃত্তি। ভারতে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র ছিল, এবং তারা প্রায় সবাই ছিল কৃষিজীবী। কেন এই দারিদ্র্য? কারা এর জন্য দায়ী? বিবেকানন্দের ভাষায় দারিদ্র্যের জন্য দায়ী কিছু লোকের "বিশ্বাসঘাতকতা"। স্বামীজী বলেছেন: "লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষালাভ ক'রে এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও যারা ঐ দরিদ্রদের কথা একটিবার চিন্তা করবার অবকাশ পায় না—তাদের আমি বিশ্বাসঘাতক বলি। যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক অজ্ঞানে ডুবে থাকবে, ততদিন তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না—এমন প্রত্যেকটি

লোককে আমি দেশদ্রোহী মনে করি। যতদিন ভারতের ত্রিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মত হয়ে থাকবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা টাকা রোজগার ক'রে জাঁকজমক দেখিয়ে বেড়াবে—আমি তাদের পামর বলি।"[৩]

দারিদ্র্যের দ্বিতীয় কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দের মনে হয়েছে মূল ক্ষতটি হচ্ছে শিক্ষার অভাব। সাধারণ মানুষ যদি শিক্ষিত হত তবে জমিদার, অভিজাত ও পুরোহিতগণ তাদের উপর অত্যাচার করার বা তাদের শোষণ করার সাহস পেত না। তাছাড়া তখনকার দিনে শিক্ষিত লোকের পক্ষে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করাও খুব কঠিন ছিল না। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তিগুলি প্রণিধান যোগ্য।

"জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজ সংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না—ক্ষতটি কোথায়।... সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।... তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।"[৪]

"শহরের সবাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকা-নির্মিত কুটির ও হল প্রস্তুত কর। গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি জোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীব, অনুন্নত, এমন কি চণ্ডালকে পর্যন্ত জড়ো কর; তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও।"[৫]

"দরিদ্রদিগকে শিক্ষাদানের প্রধান বাধা :...ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক

৩। জনগণের অধিকার—পৃঃ ৪৩

৪। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫

৫। " " " " পৃঃ ৪৩১

যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া পিতাকে তাহার কৃষি-কার্যে সহায়তা করিবে, অথবা অন্য কোন রূপে জীবিকা-অর্জনের চেষ্টা করিবে; সুতরাং যেমন পর্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্বতের নিকট গিয়াছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র বালক যদি শিক্ষালয়ে আসিতে না পারে, তবে তাহাদের নিকট শিক্ষা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।"[৬]

"দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই, স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আসে নাই। ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি শিখানো যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয় তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে।"[৭]

দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উপায় যে গরীবদের শিক্ষিত করে তোলা স্বামীজী তার ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দার পরিপ্রেক্ষিতে এ-ছাড়া অন্য কোনও পন্থা এক্ষেত্রে নির্দেশ করা যেত কিনা আমাদের জানা নেই। অর্থনৈতিক সমস্যার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে তখন গ্রামাঞ্চল থেকে সাধারণ মানুষ দুমুঠো অন্নের আশায় শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এটি যে আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের গ্রামাঞ্চলের পুঁজিবাদী সম্প্রসারণ (Capitalist expansion) হেতু উদ্বৃত্ত শ্রমিকের নির্গমন (Outflow of surplus labour) তা নয়। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের কৃষি-কাঠামো ছিল একেবারে অনগ্রসর,—যৌথ পরিবার প্রথা তখন বিশেষভাবে প্রচলিত। ক্ষেত-খামারে যতটা শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে বেশী লোক যে সেখানে কাজ করত সন্দেহ নেই। কৃষি-শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (marginal Productivity) ছিল শূন্যের কোঠায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নতুন অনাবাদী জমিকে আবাদ যোগ্য করে তোলা বা উন্নত ধরনের কলা-কৌশল প্রয়োগ করে উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালানো তার কোনটি-ই তখন সম্ভব ছিল না। এর প্রধান কারণ ছিল যাঁরা জমির মালিক ছিলেন, তাঁদের যেমন শিক্ষার অভাব ছিল, যাঁরা জমির মালিক না হয়েও জমিতে চাষ করতেন তাঁদেরও শিক্ষার অভাব

৬। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৪২

৭। " " " ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৮

ছিল। কৃষি-শ্রমিকদের বেগার খাটানো বা তাদের ক্রীতদাস করে রাখা সম্ভব হত না যদি তারা শিক্ষার আলোক পেত। এই শিক্ষার অভাব,—সেটি সাধারণ শিক্ষাই হোক অথবা কারিগরী শিক্ষাই হোক,—দারিদ্র্যের প্রধান কারণ এবং সমাজের প্রধান ক্ষত বলে স্বামীজী মনে করতেন। বর্তমানে ভারতের প্ল্যানিং কমিশনও মনে করেন যে দেশে দারিদ্র্যের মূল কারণ তিনটি,—এক, দেশের অনগ্রসরতা যার দরুণ মাথাপিছু প্রকৃত আয় খুব অল্প, দুই, বেকার সমস্যা এবং তিন, দেশের আর্থিক সম্পদের অসম বণ্টন। উনবিংশ শতাব্দীতে বেকার সমস্যা ছিল বটে। কিন্তু শিক্ষিত বেকার সমস্যার তীব্রতা ছিল না। বরং বহুক্ষেত্রে শিক্ষিত কর্মক্ষম লোকের যথেষ্ট চাহিদা ছিল এবং এজন্য যুবকরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী হত। জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় যে তখন নগণ্য ছিল তা-ও আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং দারিদ্র্যের মূল কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমরা যে-সব যুক্তি প্রয়োগ করে থাকি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রচলিত যুক্তির সঙ্গে তার খুব যে হেরফের ছিল তা নয়। অভাবের কারণ ছিল কর্মসংস্থানের অভাব,—কর্মসংস্থানের অভাবের কারণ ছিল প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব অথবা উৎপাদন প্রচেষ্টার অভাব। আবার উৎপাদন প্রচেষ্টাও শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। কৃষক যদি শিক্ষিত থাকত তবে মহাজনরা তাদের শোষণ করার সাহস পেত না। অথবা অভিজাত বা জমিদাররা তাদের বেগার খাটাতে পারত না। সুতরাং, শিক্ষার বিস্তৃতি যে এক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিল বিবেকানন্দের উক্তিতে তারই সমর্থন মেলে। ব্যাপক শিক্ষার প্রসার কৃষকদের দক্ষতা বাড়াবার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, তাদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করবে এবং উন্নততর উপায়ে উৎপাদন বাড়াবার কাজে তাদের আগ্রহী করবে,—স্বামীজী এই অভিমত-ই পোষণ করতেন।

দারিদ্র্যের আরও একটি কারণ হল আর্থিক সম্পদের অসম বণ্টন। এক্ষেত্রে স্বামীজীর মন্তব্য বর্তমানকালেও বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। স্বামীজী লিখছেন, "ইউরোপ অশান্তি সাগরে ভাসছে। বস্তু-সভ্যতার অত্যাচার প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের সব ধন, সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক লোকের করায়ত্ত।

তারা নিজেরা কোনো কাজ করে না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখে: এই ক্ষমতার দ্বারা তারা সমস্ত পৃথিবীকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করতে পাবে।···যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজের মুঠোর মধ্যে রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে, শুষছে, তারপর সেপাই ক'রে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে। জিত হলে শাসকদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে।

"এমন সামাজিক অবস্থা কিন্তু চিরস্থায়ী হতে পারে না। একথা সত্য যে, কল-কারখানা দ্রব্যাদি সুলভ করেছে, বৈষয়িক উন্নতি ঘটিয়েছে, কিন্তু কেউ ধনী হবার জন্য কেউ লক্ষ লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করবে, দরিদ্রের আরও দরিদ্র হবে, দলে দলে মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হবে—এ জিনিস চলতে পারে না। স্বার্থপরতা ও অহমিকাপূর্ণ বর্তমান ধনিক সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।"[৮] দেখা যাচ্ছে আয় ও ধনের অসম বণ্টন ধনী কর্তৃক গরীবকে শোষণ করার যে বড় হাতিয়ার এবং তাতে যে গরীবদের শোষিত হতে হয় এবং দারিদ্র্যের চাপ যে সামগ্রিকভাবে বাড়তেই থাকে, বিবেকানন্দ এ বিষয়ে বহু আগেই সতর্ক করে গেছেন।

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কুফলগুলি বিশ্লেষণ করে তার সঙ্গে দারিদ্র্যের সম্পর্ক কোথায়,—এমন খোলাখুলি আলোচনা স্বামীজার আমলে অন্য কোনো লেখকের লেখায় আমরা দেখতে পাই না। যে কথাটি তিনি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন,সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও সেই কথাটিই প্রযোজ্য। জমিদার ও মহাজন শ্রেণী শুধু কৃষকদের শোষণ করেই ধনী হয়েছে,—সেজন্যই কৃষক-দের এই দুরবস্থা। এই অবস্থার প্রতিকার করার জন্য কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন এবং সেটি সম্ভব হতে পারে শিক্ষার প্রসার হলে। সেজন্যই বিবেকা-নন্দ শিক্ষার প্রসারের ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সাধারণ মানুষকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করতে পারলেই কাজ অনেকটা এগোবে, স্বামীজী সেভাবেই নূতন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। "নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষের কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে,

৮। জনগণের অধিকার পৃঃ ৭-৮

বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোপ জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে”—এটিই ছিল তাঁর স্বপ্ন।[৯]

আমাদের অনুন্নত কৃষি-ব্যবস্থার সঙ্গে দারিদ্র্যের সম্পর্ক যে অবিচ্ছেদ্য সে বিষয়টি কোন আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। বিবেকানন্দ আরও আশি-পঁচাশি বছর আগে ভারতের কৃষি ও কৃষক সম্পর্কে যে-সব বক্তব্য রেখে গেছেন, তা আজও গ্রহণযোগ্য। কৃষির উন্নতির জন্য স্বামীজী যে-সব বক্তব্য রেখে গেছেন সেগুলির সারমর্ম এভাবে আমরা বলতে পারি। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, জমির উপর কৃষকদের অধিকার মেনে নিতে হবে। কারণ, “নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোনো বড় কাজ করতে পারে না।”[১০] সেই সঙ্গে বিজ্ঞান সম্মত চাষের প্রয়োগ-কৌশলের সঙ্গে কৃষকদের পরিচিত করতে হবে; এজন্য চাই কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার। প্রথমে সাধারণ শিক্ষা এবং পরে কারিগরী শিক্ষায় কৃষকদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। পরিব্রাজক হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ বহু দেশীয় রাজ্য পরিভ্রমণ করেছেন তখন দেখেছেন বহু ক্ষেত্রে রাজা-মহারাজাগণ কৃষকদের অবহেলা করেছেন। সেসব ক্ষেত্রে তিনি রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে কিভাবে রাজ্যের কৃষি-ব্যবস্থা উন্নত করা যায় এবং কিভাবে কৃষিজীবীদের দারিদ্র্য দূর করা যায় ও তাদের শিক্ষিত করে তোলা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১১] স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থে দেখা যায় ভুজ রাজ্যের দেওয়ানের সঙ্গে তিনি রাজ্যের কৃষি, আর্থিক উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা করেন।[১২] বিদেশের কৃষি-বিজ্ঞান সম্পর্কেও স্বামীজীর গভীর আগ্রহ ছিল। মেরী লুই বার্ক (Marie Louise Burke) তাঁর “Swami Vivekananda in America : New Discoveries”

৯। জনগণের অধিকার পৃঃ ৩০

১০। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১৮৫ (প্রথম সংস্করণ)

১১। “স্বামীজীর কৃষিচিন্তা”—প্রণবেশ চক্রবর্তী। ‘চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ’ গ্রন্থে লিখিত। (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার) স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, নচিকেতা ভরদ্বাজ ও স্বামী সোমেশ্বরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত।

১২। স্বামী বিবেকানন্দ, মানদাশঙ্কর দাসগুপ্ত পৃঃ ২৫৩

বইয়ে বলেছেন যে স্বামীজী বিদেশে শুধু যে বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শেই আসতেন তা নয়,—তিনি আমেরিকা পরিভ্রমণ কালে সে দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের সংস্পর্শেও আসতেন, তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন।[১৩] বিদেশে কৃষির উন্নতি দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রযুক্তি-বিদ্যার যথাযথ প্রয়োগ ভারতের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য তিনি দেশের যুবকদের আহ্বান করেছিলেন গ্রামে গ্রামে গরীব চাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে এবং তাদের শিক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে।

আমেরিকার কৃষিব্যবস্থার উন্নতি বিবেকানন্দের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু কোনো কিছুরই অন্ধ অনুকরণ তিনি পছন্দ করতেন না,—এমন কি আমেরিকার কৃষি ব্যবস্থারও না। ভারতের কৃষি জোতের আয়তন তখন ছিল খুবই ছোট; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-জোত ছিল বৃহদায়তন। ভারতে জমির উপবিভাজন ও বিখণ্ডন (Subdivision and Fragmentation of lands) ছিল একটি ঘটনা এবং তার নিরসনকল্পে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোনও চেষ্টা চলেনি। তার ফলে ক্ষুদ্র আকারের কৃষি-জোতের মাধ্যমেই কৃষির উন্নয়ন করতে হবে বিবেকানন্দ তাই বিশ্বাস করতেন। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন যে, যদিও তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যন্ত্রসহায়ে বড়বহরে আমেরিকার মতো এদেশেও চাষ করলে ভারতের উন্নতি হবে, এখন তিনি দেখছেন যে সে ধারণা ভুল; কেননা আমেরিকার চাষীর পক্ষে এ পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব; তার জোতের পরিমাণ কয়েক মাইল নিয়ে গঠিত। কিন্তু ভারতে ঐ পদ্ধতি অচল; কারণ ভারতে জোতের পরিমাণ অনেক ক্ষুদ্র।[১৪] কৃষকদের শিক্ষার জন্য "কর্মশালা"(Workshop) গঠনের কথা স্বামীজী বলেছিলেন;—তবে তাঁর পরিকল্পনা ছিল গ্রামের লোকেদের শিক্ষিত করে ও কৃষির উন্নতি করে একটি সুস্থ ও সবল গ্রামীণ জীবন গড়ে তোলা।

১৩। Swami Vivekananda in America—New Discoveries—Marie Louise Burke P. 596

১৪। "চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ" প্রণবেশ চক্রবর্তী "স্বামীজীর কৃষিচিন্তা" প্রবন্ধে উদ্ধৃত। Sister Nivedita—My Master As I Saw Him. P. 221.

কৃষির উন্নতির সার কথা হল উৎপাদন বৃদ্ধি। একর প্রতি জমিতে মূলধন ও শ্রম নিয়োগ করলেই চলবে, যতটা সম্ভব উৎপাদন বাড়াবারও চেষ্টা করতে হবে। কৃষি-উৎপাদন বাড়িয়ে যে খাদ্য সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজন সর্বাগ্রে, স্বামীজী সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। এপ্রিল ১৮৯৯ সালে প্রবুদ্ধ ভারতে যে-লেখা বেড়িয়েছিল সেটি স্বামীজীর দ্বারা বা তাঁর নির্দেশেই বেরিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, "যদি ভারতকে বাঁচতে বা উন্নতি করতে হয়, যদি পৃথিবীর মহান জাতিসমূহের মধ্যে ভারতীয় জাতিকে স্থান লাভ করতে হয়, তাহলে প্রথমেই খাদ্যসমস্যাব সমাধান করতে হবে। আর এই তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে ঐ সমস্যার সমাধান একমাত্র হতে পারে—মানব জাতির প্রধান দুই অন্নদাতা—কৃষি ও বাণিজ্যের অন্ধিসন্ধিতে আধুনিক বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের দ্বাবা।"[১৫] আজ আমরা যেভাবে ভারতের কৃষি-উন্নয়নের কথা ভাবছি, পঁচাশি বছর আগে স্বামীজীও ঠিক একই চিন্তা করেছিলেন। মনে হয় এই ধরণেব চিন্তাধারায় তিনি তৎকালীন যুগ থেকে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ-ও (Commercialisation) বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ; স্বামীজী এই জিনিসটির কথাও ভেবেছিলেন।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিপরিকল্পনা নিয়ে যখন আমাদের দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তখন স্বামীজীর এই উক্তি আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বামীজী গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন "দেশের কৃষকেরা ও বিশেষ করে ছাত্রেরা বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে কৃষি ব্যাপারে নানারকম শিক্ষা গ্রহণ করবে। আমার যদি টাকা থাকতো তোমাদের প্রত্যেককেই পৃথিবী পর্যটনে পাঠাতাম।"[১৬] কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র (Agricultural Research Institute) স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে আমরা বর্তমানে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কিন্তু বহু আগেই স্বামীজী এক এক রাজধানীতে এক একটি কেন্দ্র স্থাপন করার কথা বলেছিলেন

যাতে ঐ কেন্দ্রগুলিতে কৃষিবিদ্যার সঙ্গে কৃষকদের পরিচিত করানো যায় এভাবে কৃষি-বিদ্যা সম্পর্কিত কর্মশালা খোলার গভীর আগ্রহ তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিতে কৃষিকাজের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এই ধারার সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন স্বামীজী। শুধু কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনই নয়, Dairy farming. Poultry farming প্রভৃতিও কৃষি উন্নয়নের অঙ্গ। স্বামীজী এবং তার অনুগামীরা বিশ্বাস করতেন শুধু ধ্যান-ধারণা করলে ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করলেই সমাজ ও দেশের প্রতি সব কর্তব্য করা হল না। নিজের মুক্তির চেয়েও তাঁরা পৃথিবীর আর্ত ও দরিদ্রের মুক্তিকে বেশী মূল্যবান করতেন। কারণ 'বহুজনহিতায়" ভাবে প্রেম করাকেই তাঁরা সাধনার মূলকথা বলে জেনেছেন। নর-নারায়ণের সেবা করাই তাঁদের ধর্ম। "দরিদ্রদেবো ভব",—এই কথাটি কত তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর। মানুষের মুক্তির একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ হল অর্থনৈতিক মুক্তি. এবং এই অর্থনৈতিক মুক্তির উপায় হল দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি।

উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কগণ যেভাবে দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির কথা চিন্তা করেছিলেন,—বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী তার থেকে যথেষ্ট স্বতন্ত্র দাদাভাই নওরোজীর মতামতের সঙ্গে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতামতের সঙ্গে বিবেকানন্দের সামান্য কিছুটা মিল আছে; কিন্তু স্বামীজীর চিন্তাধারা এক্ষেত্রে অনেক বৈপ্লবিক, এবং তৎকালীন যুগের ধারণার চেয়ে অনেক অগ্রবর্তী। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর কোন কোন লেখা ও বক্তৃতায় দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের ধ্যান-ধারণা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রানাডে ও রমেশচন্দ্র দত্তের মতামত আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

ভারতে শিল্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল ভারতে যন্ত্র শিল্পায়ন সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত যুক্তি। অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষি ও শিল্প উভয়েরই উন্নয়ন প্রয়োজন। বিবেকানন্দ এই জি • সটি বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু দেশের শিল্পায়ন যে তখন খুবই জরুরী হয়ে পড়েছিল এবং ইংরেজ শাসকগণ যে নিজেদেব স্বার্থেই ভারতের শিল্পায়নে বিরোধিতা করবেন এটি বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন বলেই দেশের যন্ত্র শিল্পায়ন সম্পর্কে তাঁর ভাবনা—চিন্তার শেষ ছিলনা। তৎকালীন ভারতবর্ষে • ন্যত্র কিছু কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তিও স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার অংশীদার ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর "পর পর দুটি দুর্ভিক্ষ দেশের সকল চিন্তাশীল মানুষকে ভারতীয় জাতির ভবিষৎ সম্বন্ধে সচেতন হতে বাধ্য করেছে"।[১] এই মন্তব্যের কিছু পর সম্পাদক "কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহদান" প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের মহামান্য গভর্ণর এবং বরোদার গায়কোয়াড়ের সমর্থনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও এইসময় দেশের শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তখনকাব দিনে শিল্প-প্রদর্শনীরও (Industrial Exhibition) অনুষ্ঠিত হত। তখনকার নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই ধারণাও প্রচলিত হয়েছিল যে বিলেতী দ্রব্য বয়কট করার সঙ্গে দেশীয় শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। বরং বিলেতী দ্রব্য বর্জনকে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে—পুনার "মারাঠা" পত্রিকা এ ধরনের মন্তব্যও করেছিল। দেশীয় শিল্পের উৎকর্ষ বাড়িয়ে বিদেশী দ্রব্যের প্রতিযোগিতাকে পরাভূত করার প্রয়োজনীয়তাও অনেকে অনুভব করেছিলেন। তখন জামসেদজী

১। Mahratta, May 13, 1900 Commercial and Industrial Education. শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসুর "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" বইয়ের পঞ্চম খণ্ডে,

টাটা (যিনি পরবর্তীকালে ভারতের শিল্পপতিদের মধ্যে অগ্রণী হয়েছিলেন) ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করতেন, তাঁর জীবনীর ভূমিকায় জে আর ডি টাটা লিখেছেন: জামসেদজী বুঝেছিলেন—ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিন মৌল প্রয়োজন; ইস্পাত, বিদ্যুৎ এবং গবেষণাসহ কারিগরি শিক্ষা।[২] যে মৌল প্রয়োজনের কথা জামসেদজী টাটা তখনকার দিনে বুঝেছিলেন, তার গুরুত্ব আজও অপরিবর্তিত, জামসেদজী টাটার সঙ্গে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ এবং বিবেকানন্দ কর্তৃক টাটা-কে প্রেরণা ও উৎসাহ দান তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার একটি বিশেষ দিক আলোচনা করতে আমাদের সাহায্য করে। টাটা যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ চেয়েছিলেন—আর তাতেই স্বামীজীর প্রথমাবধি গভীর আগ্রহ ছিল।

বিবেকানন্দ যখন প্রথমবার আমেরিকা যাত্রা করেন তখন জাহাজেই টাটার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় বলে স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন: "সুপ্রসিদ্ধ টাটা সেই জাহাজে ছিলেন। স্বামীজী পত্রে লিখিয়াছিলেন যে তিনি টাটাকে বলিয়াছিলেন, জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেশে বিক্রয় করে জাপানকে টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি ত সামান্য কিছু দস্তুরী পাও মাত্র; তার চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রতিপালন হবে এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে।" শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি যে তখন টাটা স্বামীজীর প্রস্তাবে সম্মত হননি। কারণ তাঁর জাপানি দেশলাই সম্পর্কিত ব্যবসা একচেটিয়া ছিল। কিন্তু স্বামীজী টাটা-কে যা বলেছিলেন তার তাৎপর্য ছিল দেশে শিল্প স্থাপন করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। ১৮৯৮ সালে জামসেদজী টাটা তিরিশ লক্ষ টাকা দান করলেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্প্রসারণের জন্য। পরবর্তীকালের বিশ্বখ্যাত Tata Institute For Research in Fundamental Sciences. ভারতে বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টাটার এই সুবিপুল দান

২। শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু—বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ পঞ্চম খণ্ড পৃঃ ২৬২

৩। শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত—শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী তৃতীয় খণ্ড

বেসরকারী মহলে অভিনন্দিত হলেও তখনকার সরকারী মহলে এটি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহন কারে করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে ১৮৯৮ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে স্বামীজীকে লেখা টাটার একটি চিঠি উল্লেখযোগ্য। চিঠিটি এই:

"প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ, আমার বিশ্বাস আপনি জাপান থেকে চিকাগোর পথে জাহাজে সহযাত্রীরূপে আমাকে মনে রেখেছেন। ভারতে সন্ন্যাসীসুলভ ত্যাগের আদর্শের পুনর্জাগরণ, ঐ আদর্শকে ধ্বংস করার পরিবর্তে যথাযোগ্য পথে চালিত করার কর্তব্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত বর্তমান মুহূর্তে আমার বিশেষভাবে মনে পড়বে।

"ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনার কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন বা পড়েছেন; এই প্রসঙ্গে আপনার চিন্তা ও ভাবরাজির কথা আমি স্মরণ করছি। মনে হয়, যদি ত্যাগব্রতী মানুষেরা মানুষেরা আশ্রমজাতীয় আবাসিক স্থানে অনাড়ম্বর জীবন যাপন ক'রে প্রাকৃতিক ও মানবিক বিজ্ঞানের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করে—তাহলে তার অপেক্ষা ত্যাগাদর্শের শ্রেষ্ঠতর প্রয়োগ আর কিছু হতে পারে না। আমার ধারণা, এই জাতীয় ধর্মযুদ্ধের দায়িত্ব কোনো যোগ্য নেতা গ্রহণ করলে তার দ্বারা ধমের ও বিজ্ঞানের উন্নতি হবে, এবং দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। আর, এই অভিযানে বিবেকানন্দের তুল্য মহানায়ক কে হতে পারেন! আপনি কি এই পথে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে নবজীবন দান করবার জন্য আত্মনিয়োগ করবেন? বোধহয় শুরুতে এ-ব্যাপারে জনসাধারণকে উদ্দীপিত করবার জন্য অগ্নিময় বাণী সংকলিত একটি পুস্তিকা প্রচার করলেই ভালো করবেন। প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার আমি সানন্দে বহন করব শ্রদ্ধান্ত,

হে প্রিয় স্বামীজী, আপনার বিশ্বস্ত, জামসেদজী এন টাটা।"[৪]

টাটা বুঝতে পেরেছিলেন, শুধু টাকা দিয়েই তার কাজ সফল হবে না, এজন্য প্রয়োজন কাজে উৎসর্গীকৃত মানুষ, আরে মানুষকে উদ্দীপিত করার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ থেকে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। টাটার অনুরোধক্রমে স্বামীজী কোনো পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন কিনা জানা যায়নি। তবে ১৮৯৯

৪। শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু—বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ পঞ্চম খণ্ড পৃঃ ২৪৫

সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রবুদ্ধ ভারতে টাটা পরিকল্পনার সমর্থনে রামকৃষ্ণ মঠের যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তা স্বামীজীর বক্তব্য বলেই ধরে নেওয়া যায়।

শ্রী শঙ্করী প্রসাদ বসু প্রবুদ্ধ ভারতের উক্ত লেখা উদ্ধৃত করেছেন :[৫]

"ভারতের মঙ্গলের জন্য এ-পর্যন্ত যত পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে মিঃ টাটার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ইউনিভার্সিটি পরিকল্পনার অপেক্ষা সময়োচিত ও সুদূরপ্রসারী ফলপ্রদ আর কিছু হয়েছে কিনা সন্দেহ। পরিকল্পনাটি আমাদের জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে ঠিক দুর্বল জায়গাটি কোথায় তা পরিস্কার অনুধাবন ক'রে, তার দূরীকরণে যে-প্রকার স্বচ্ছদৃষ্টি, সুনির্দিষ্ট বুদ্ধি দেখিয়েছে, তার অনুরূপ শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র দেখা গেছে ঐ পরিকল্পনার সহগামী বিপুল বদান্যতার মধ্যে।

"মিঃ টাটার পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে এখানে প্রবেশ করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের পাঠকগণের সকলে নিশ্চয়ই এ-সম্বন্ধে মিঃ পাদ্‌শার প্রাঞ্জল রচনা পড়েছেন এখানে কেবল আমরা এর পশ্চাদ্বর্তী নীতির রূপটি তুলে ধরব

"যদি ভারতকে বাঁচতে ও উন্নতি করতে হয়, যদি পৃথিবীর মহান জাতি সমূহের মধ্যে ভারতীয় জাতিকে স্থানলাভ করতে হয়, তাহলে প্রথমেই খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে হবে আর এই তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে ঐ সমস্যার সমাধান একমাত্র হতে পারে—মানবজাতির প্রধান দুই অন্নদাতা—কৃষি ও বাণিজ্যের অন্ধিসন্ধিতে আধুনিক বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের দ্বারা।

"এখন প্রতিদিন আধুনিক মানুষ যে-হারে চতুর কলাকৌশল বাড়িয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুরাতন পদ্ধতি কদাপি টিকতে পারবেনা। যারা সবচেযে কম শক্তি ও অর্থব্যয় ক'রে প্রকৃতির কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি আদায় ক'রে নিতে না-পারবে—তাদের পক্ষে দ্বার রুদ্ধ—পতন ও বিনাশই তাদের নিয়তি—কোনোই অব্যাহতি নেই

"কারো—কারো কাছে পরিকল্পনাটি কল্পনাবিলাসে পূর্ণ ; কারণ এর জন্য বিপুল অর্থ প্রয়োজন, অন্ততঃ ৭৪ লক্ষ টাকা। এই আশঙ্কার উপযুক্ত উত্তর :

৫। শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু—"বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" পঞ্চম খণ্ড পৃঃ ২৪৫

যদি একজন মানুষ, যিনি দেশের মধ্যে সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি নন একলা ৩০ লক্ষ টাকা দিতে পারেন, তাহলে অবশিষ্ট দেশ কি বাকি অর্থ জোটাতে পারবে না? ও হেন চিন্তা করা কি বিসদৃশ ব্যাপার হবেনা—যখন আমরা এই পরিকল্পনার বিশাল গুরুত্বের কথা জানি।

"পুনর্বার বলছি: আধুনিক ভারতে সমগ্র জাতির মঙ্গল-সম্ভাবনায় আকীর্ণ এই ধরনের আর কোনো পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয়নি। সুতরাং সমস্ত জাতি যেন শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত ক্ষুদ্র স্বার্থের উপরে উঠে পরিকল্পনাটিকে সফল করবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন।" প্রবুদ্ধ ভারতের এই সম্পাদকীয় থেকে বোঝা যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সম্প্রসারণে স্বামীজী কত আগ্রহী ছিলেন, এমন কি রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মাদর্শের যে খসড়া স্বামীজী প্রস্তুত করেন তার দু'টি ধারা হল: "এখন উদ্দেশ্য এই যে এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ টেকনিক্যাল Institute করিতে হইবে। এইটি প্রথম কর্তব্য, পরে অন্য অবযব ক্রমে-ক্রমে যুক্ত হইবে।"

"মহাবলশালী সমাজভিত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করাই একমাত্র উপায়—যে-স্থানে নরনারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর বন্ধন সমাজশাসন হইতে দূরে থাকিয়া নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নববলে বলীয়ান হইবে···মধ্যভারতে হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলার নিকট উর্বর, সজল, স্বাস্থ্যকর অনেক ভূমি এখনও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ প্রদেশে এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া তাহার উপর একটি বৃহৎ শিল্প-বিদ্যালয় ও ধীরে ধীরে কারখানা ইত্যাদি খুলিতে হইবে। অন্নাগমের নূতন পথ যেমনই আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে লোক তেমনই উক্ত উপনিবেশে আসিতে থাকিবে।"[৬] মধ্যভারতে এবং বিহারের খনিজ সম্পদ যে দেশের শিল্পায়নের কাজে লাগাতে পারে স্বামীজীর তা অজানা ছিল না। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, দেশকে বাঁচাতে হলে, দেশের মানুষকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে

৬। সরলাবালা সরকার—"স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘ।"

গেলে যে উদ্যোগের প্রয়োজন, রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ তার প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন শুধু ধর্মচর্চার কেন্দ্রমূল হয়েই থাকবেনা, দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, দেশের শিল্প-বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য এবং দেশের মানুষকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় নির্দেশের জন্য তাকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। স্বামীজীর চিন্তাধারা এক্ষেত্রে বৈপ্লবিক। যে যুগে স্বামীজী শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণের কথা বলেছিলেন, তখন একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর পক্ষে এ-ধরনের উক্তি করা অভাবনীয় ছিল। স্বামীজীর চিন্তাধারা এক্ষেত্রে সমসাময়িক ভাবনা-চিন্তা থেকে অনেক বেশি এগিয়ে ছিল। ধর্মীয় আন্দোলনের যে একটি অর্থনৈতিক পটভূমিকা থাকে এ-সম্পর্কে স্বামীজীর উক্তি হল: "প্রত্যেক ধর্ম-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ধারা বয়ে চলেছে। মানুষের উপরে ধর্মের কিছু প্রভাব আছে বটে, কিন্তু সে পরিচালিত হয় অর্থনীতির দ্বারা। কোনো একটি ধর্মমত সর্বাঙ্গসুন্দর না হতে পারে কিন্তু যদি তার পিছনে অর্থনৈতিক পটভূমিকা থাকে এবং কিছুসংখ্যক উৎসাহী সমর্থক তার প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তাহলে একটি গোটা দেশকে ঐ ধর্মমতে নিয়ে আসা সম্ভবপর।

"সুতরাং যখন কোনো ধর্মমত সফল হয়, তখন বুঝতে হবে, অবশ্যই তার আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরনের হাজার সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য লড়াই করলেও যে-সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে পারে, সে-ই প্রাধান্যলাভ করবে। পেটের চিন্তা, অন্নের চিন্তা মানুষের প্রথম চিন্তা। মানুষ যখন হাঁটে, তখন তার পেট চলে আগে, মাথা চলে পরে, তা কি লক্ষ্য করনি?"[৭]

দেশের কল্যাণের জন্য জন্য ধর্মের সঙ্গে অর্থনৈতিক চিন্তার সমন্বয় বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা যে-ভাবে দেখেছি, তারই বাস্তব রূপায়ণ হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক স্থাপিত বিভিন্ন শিল্প-বিদ্যাপীঠ ও কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যে।

স্বামীজী যখন ভারতের শিল্পায়ন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ করেন, তখন

৭। জনগণের অধিকার—৬১ পৃঃ।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশ শিল্পোন্নত হয়ে গেছে। জাপানও তখন দ্রুত শিল্পোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। স্বামীজী এ-সব দেশ পরিভ্রমণ করে তৎকালীন প্রযুক্তি বিদ্যার বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিভাবে একটি দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে—সে সম্পর্কেও তার ধারণা ছিল স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার ১৯৩০ সালের নভেম্বর সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছিল,—সেটি হল স্বামীজী কোন্ পথে ভারতের শিল্পায়ন চেয়েছিলেন—ক্ষুদ্র শিল্প না বৃহৎশিল্প? প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকের মতে স্বামীজী ছিলেন যন্ত্রশিল্পের সমর্থক,— এবং সেটি বৃহৎশিল্পের মাধ্যমেই হতে হবে। অবশ্য এজন্য স্বামীজী বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের অন্ধ সমর্থক ছিলেন না। একটি ক্ষেত্রে স্বামীজী বলেছিলেন, অল্পস্বল্প যন্ত্রপাতি ভালো, কিন্তু বেশি যন্ত্র মানুষকে যান্ত্রিক করে ফেলে। ভারতের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁর মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল। কিন্তু স্বামীজী এজন্য কখনও বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের বিরোধী ছিলেন না। ইংরেজরা ভারতের মত বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে কাচামাল নিজেদের দেশে নিয়ে যেত এবং নিজেদের শিল্পজাত সামগ্রী উপনিবেশগুলিতে বিক্রী করত। প্রকৃতপক্ষে শিল্প-বিপ্লবের পর ইংলণ্ডে যে প্রভূত শিল্পোন্নতি হয় তার পরিণতি হিসাবে শিল্পজাত জিনিসগুলির জন্য বাজারের সম্প্রসারণ করা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজদের একটি বড় বাজার। স্বামীজী ভারতবাসীকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। এজন্যই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণের ওপর। স্বামীজী মনে করতেন, ভারত পাশ্চাত্য থেকে নেবে তার প্রযুক্তিবিদ্যা। এই বিনিময়ের মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; কিন্তু শুধু বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে থাকা তিনি সমর্থন করতেন না। পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লবের সুফল তিনি দেখেছিলেন, আবার শিল্পায়নের ফলে আমেরিকায় একচেটিয়া ক্ষমতার

৮। শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু—বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ পঞ্চম খণ্ড পৃঃ ২৬৪।

সম্প্রসারণ এবং শিল্পক্ষেত্রে মন্দাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ১৮৯৩ সালে আমেরিকায় Sherman's Anti-Trust Act প্রণীত হয়; সেই বছরেই সেদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দা পরিলক্ষিত হয়। এটা যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি বিবেকানন্দ তা বুঝতে পেরেছিলেন। যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে যে উৎপাদন সম্প্রসারিত হয় তার ফলেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়—এবং তার ফলেই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়,—বিবেকানন্দ এই জিনিসটি সম্পর্কে দেশবাসীকে সজাগ রেখেছিলেন। তিনি লিখছেন: "যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে, শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হ'লে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল ...।"[৯]

যন্ত্রশিল্পের সমর্থক বলে বিবেকানন্দ কি ক্ষুদ্র শিল্পকে অবহেলা করেছিলেন? নিশ্চয়ই তা নয়। কিন্তু সেজন্য গান্ধীজীর মতো শুধু চরকা বা কুটিরশিল্পের উপর নির্ভর করে থাকার পক্ষপাতী বিবেকানন্দ ছিলেন না। শিল্পায়ন বলতে স্বামীজী বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণই বুঝতেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৩০ সালের লেখায় প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক স্বামীজীর কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করেন:[১০] "আমাদের বস্তুজ্ঞান অর্জন করতে হবে যাতে আমরা (বিদ্যুৎ ও অন্যান্য) শক্তিকে সংগঠিত করে ব্যবহার করতে সমর্থ হই। এ-জিনিস কিছুটা আমাদের পাশ্চাত্য থেকে শিখতেই হবে।" "ভারতকে ইউরোপের কাছ থেকে বহিঃ প্রকৃতিকে কিভাবে জয় করতে হয় তা শিখতে হবে, আর ইউরোপকে ভারতের কাছ থেকে শিখতে হবে অন্তঃ প্রকৃতি জয়ের রহস্য।" "তোরা একটা ছুঁচ পর্যন্ত তৈরী করতে পারিস না, তবু ইংরেজদের সমালোচনা করিস্! ওরে নির্বোধ, আগে তাদের পায়ের কাছে বসে যন্ত্রশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কার্যকরী বুদ্ধি শিখে নে, যাতে জীবনযুদ্ধে জিততে পারিস।"

৯। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ :৬২ পৃঃ।

১০। শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু—"বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" (পঞ্চম খণ্ড) পৃঃ ২৬৫ থেকে গৃহীত।

"প্রতি শহরে, প্রতি গ্রামে একটি করে মঠ করতে হবে। সেখানে একজন সুশিক্ষিত সাধু মোহন্ত হয়ে থাকবেন। তাঁর অধীনে কার্যকরী বিজ্ঞান ও শিল্প শেখানোর বিভিন্ন বিভাগ থাকবে। সেই বিভাগগুলির পরিচালনা করবেন এক-একজন বিশেষজ্ঞ সন্ন্যাসী." "আমাদের দরকার কারিগরি শিক্ষা এবং অনুরূপ বস্তু, যা ইনডাসট্রি-এর উন্নতিতে সাহায্য করবে।" "যদি বাঁচতে হয় তাহলে আমাদের বৈজ্ঞানিক জাতি হতে হবে।" "মাড়োয়ারিরা ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে সামান্য লাভ করে। যদি তারা ইউরোপীয়দের পকেট ভরাবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কতগুলি ফ্যাক্টরি ও ওয়ার্কশপ তৈরি করত, তাহলে তাদেরও লাভ হত, আর দেশেরও দূরপ্রসারী মঙ্গল হত।"

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি থেকে বোঝা যায় বিবেকানন্দ প্রাচীন কুটিরশিল্পের ওপর খুব আস্থাবান ছিলেন না। স্বামীজী ভারতে যন্ত্রশিল্পায়ন সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি কোনো বিশেষ শিল্পের উন্নতির সমস্যা বা উন্নতির উপায় নিয়ে আলোচনা করেন নি। আমরা আগেই বলেছি,—বিবেকানন্দ অর্থনীতিবিদ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর একটি অর্থনৈতিক চিন্তা ছিল এবং সেই চিন্তা কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে সেদিকে প্রবাহিত হত। এ কথা বললে ভুল হবে যে স্বামীজী যন্ত্রসভ্যতার দোষ জানতেন না। কিন্তু স্বামীজী একদিকে যেমন শিল্পায়নের কথা বলেছেন, অপরদিকে তিনি খাদ্যাভাব দূর করা, কৃষির উন্নতি করা প্রভৃতির কথাও বলেছেন। স্বনিয়োজিত কর্মের (Self-employment) ওপর বিবেকানন্দ গুরুত্ব আরোপ করতেন। যুবকদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার ওপর তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন। দেশে কুটিরশিল্পের দুর্দশা সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন, এবং গ্রামীণ কারিগরদের কাজে উৎকর্ষ পুনরুজ্জীবিত করার কথাও বিবেকানন্দ বলেছেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন: "ভবিষ্যৎ বাঙলাদেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায়নি। বিশেষ দুর্দশা হয়েছে শিল্পের।...নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরানগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে না কি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যি চচ্চড়ি॥ কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনও দূর পাড়াগাঁয়ে পুরান কাঠের কাজ, ইটের কাজ দেখে এসগে।

কলকাতার ছুতোর একজোড়া দোর পর্যন্ত গড়তে পারে না। দোষ কি আগড় বোঝবার জো নেই !!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতি যন্ত্র কেনা !! এই অবস্থা সর্ব বিষয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের যা ছিল, তা তো সব যাচ্ছে, অথচ বিদেশী শেখবার মধ্যে বাক্যি-যন্ত্রণা মাত্র !!"[১১]

বৃহদায়তন উৎপাদনে, বিশেষ করে যান্ত্রিক সভ্যতার সম্প্রসারণে অল্পসংখ্যক লোকেদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। আমেরিকায় এ-জিনিসটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। স্বামীজীর ভাষায় "যন্ত্র-উৎপাদন মাধ্যমে প্রচণ্ড ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং তার ফলে আজ যেরকম বিশেষ সুবিধা দাবি করা হচ্ছে, তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথায়ও মেলে না।"[১২] বৃহদায়তন শিল্পের এই ত্রুটি সম্পর্কে বিবেকানন্দ অবহিত ছিলেন বলেই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংস্থার প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব ছিল না। ভগিনী নিবেদিতার মতে ব্যবসাতে বেশি মূলধন নিয়োগে বেশি লাভের সম্ভাবনা, এইরূপ মতাবলম্বীদের বিপক্ষে স্বামীজী যারা অল্প জমিতে চাষ করে অথবা অল্প মূলধন নিয়ে কৃষিজাত-সামগ্রীর কারবার করে তাদের সর্বদা সমর্থন করতেন।[১৩] নিবেদিতার মতে স্বামীজী সর্বক্ষেত্রে এমনকি সরবরাহের ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র সংস্থা, ছোট ব্যবসায়ীর বিলোপসাধন করতে পারে, এরূপ যুক্তিকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, বড় সংগঠনের সংহতিকেও তিনি প্রশংসা করতে সক্ষম ছিলেন।[১৪]

বৈদেশিক সাহায্য যে ভারতের যান্ত্রিক শিল্পায়নের অন্যতম উপায় বিবেকানন্দ এটা স্বীকার করতেন। পাশ্চাত্য থেকে কারিগরি সাহায্য ভারত নেবে, এবং তার বিপক্ষে বিদেশকে দেবে, আধ্যাত্মিকতা। বিদেশ থেকে যন্ত্রাদি ভারতে আনা এবং বিদেশে ধর্মপ্রচারক পাঠানো সম্পর্কে স্বামীজী গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীদের মতে বিদেশ থেকে সাহায্য না নিয়ে

১১। বিবেকানন্দ—বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড ২:৪ পৃঃ "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,"

১২। Complete Works vol. 1. (1957) P. 425

১৩। Sister Nivedita—'The Master As I Saw him' P. 295

১৪। I bid, P. 222

কোনও রাষ্ট্রই শিল্পোন্নত বলে নিজেকে দাবি করতে পারে না। উন্নতিকামী দেশগুলির ওপর নির্ভর করতেই হবে; তার মানে এই নয় যে দেশের কাঁচামাল বিদেশী ব্যবসায়ীদের মুনাফার পরিমাণ বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হবে।

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কেও বিবেকানন্দ অবহিত ছিলেন। ভারতের বাণিজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছেন: "মানব জাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদিকাল হতে, উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। এ ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি এদেশের মত কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ, এলাচ, মরিচ, জায়ফল, জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান—ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই যে দেশ যখন সভ্য হত, তখন ঐ সকল জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করত এই বাণিজ্য দুটি প্রধান ধারায় চলত, একটি ডাঙাপথে আফগানি ইরাণী দেশ হয়ে, আর একটি জলপথে রেড-সী হয়ে।"[১৫] সুয়েজখাল খনন করার পর ভূমধ্যসাগর আর লোহিত সাগরের সংযোগ হয়ে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের যে অত্যন্ত সুবিধা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে স্বামীজী এই কথাগুলো বলেছিলেন। স্বামীজী আরও বলেন, "ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য, রাজস্ব—সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিসপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্ছে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই।"[১৬]

বৈদেশিক সাহায্য ও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা বিবেকানন্দের লেখায় পাওয়া যায় না। কিন্তু, তবুও প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী যখন এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তখন এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার

১৫। বিবেকানন্দ—বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১০৫ পৃঃ "পরিব্রাজক",

১৬। ঐ—১০৬ পৃঃ

স্বচ্ছতা দেখে আমরা বিস্ময়ে অবাক হই।

স্বামীজী দেশের দ্রুত শিল্পায়ন চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্যই কৃষির উন্নয়ন যে খুব জরুরী সেটা তিনি জানতেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্রুত শিল্পায়নের পথ ধরেই ভারতকে এগোতে হবে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রশিল্পকে যে তিনি অবজ্ঞা করেছেন তা মনে করা ভুল হবে। যদি তা-ই হত, তবে তিনি মিঃ টাটাকে দেশে দিয়াশলাইয়ের কারখানা খুলতে বলতেন না।

শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে জাপানকে দ্রুত এগোতে দেখে বিবেকানন্দ ভারতে যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নে বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন, এ বিষয়টি আগে আলোচিত হয়েছে। বিবেকানন্দের সময়ে বিভিন্ন ভারতীয়দের মধ্যে এই ধরনের চিন্তা যে খুবই সক্রিয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন সংবাদপত্রে। শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" (পঞ্চম খণ্ড) বইয়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[১] কলকাতার বেঙ্গলী পত্রিকায় ১৯০১ সালের ২৭ জুলাই, ১০ আগষ্ট, ১৫ আগষ্ট, এই তিন সংখ্যায় "Can we successfully imitate Japan"? নামে তিনটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ বেরোয়। বেঙ্গলী পত্রিকার ১৫ই আগষ্ট, ১৯০১ সংখ্যার নিবন্ধে যা লেখা হয়েছে তাতে স্বামীজীর চিন্তাধারার প্রভাব খুবই স্পষ্ট ছিল।[২]

Madras Mail পত্রিকায় ১৮৯৯ সালের ১৮শে অক্টোবর "Mr. Tata's Scheme" নিবন্ধে বলা হয়,

"It is extraordinary that whilst it is recognised that so much of affluence of England has depended upon her manufactures and there again upon her stores of coal and iron, the British administration in this country should have made such absolutely feeble and inadequate efforts to ascertain the indigenous sources of both. The tendency has too often been to trammel private effort by

১। এই পরিশিষ্টের উদ্ধৃতিগুলি শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসুর "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

২। শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু—"বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" পঞ্চম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ।

endless red-tape……Let us, if possible, have trained mineralogists and geologists who can localise and appraise our mineral wealth; let us have trained mechanical engineers……let us have experts in manufactures of glass, paper, rope, iron, china and storeware…… Wakened from a torpor of exclusiveness and semi-barbarism only thirty-five years back, Japan has in a single generation entered the markets of the world as a large producer."

Madras Mail কাগজে জাপানের শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে যা লেখা হয়েছিল তার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারার অভিন্ন যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়। জাপানে ১৮৭৮-১৯০০ সাল পর্যন্ত Meiji যুগ ছিল,—অর্থনীতিবিদ রস্টোর (Rostow) মতে এই সময়টি ছিল অর্থনৈতিক প্রগতির পথে জাপানের উত্তরণ-পর্ব (Take-off stage); আমেরিকার এই উত্তরণ-পর্ব এসেছিল ১৮৪৩-১৮৬০ সালে আর ইংলণ্ডে এটা এসেছিল শিল্প-বিপ্লবের সময়ে (১৭৮৩-১৮০২)। ভারতে বর্তমান শতাব্দীর ষাটের দশকেও এই উত্তরণ-পর্বটি আসেনি; ভারতের তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্ব-নির্ভরশীল উন্নয়নের পথে উত্তরণ-পর্বে উপনীত হওয়া। বিবেকানন্দ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেননি। তখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা ভেবে দেখারও কোন কারণ ছিল না। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রথম আরম্ভ হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকে। সুতরাং স্বামীজী যেভাবে দেশের শিল্পায়নের চিন্তা করতেন, আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষায় তাকে অসম-উন্নয়ন পদ্ধতি (Technique of unbalanced growth) বলা চলে। পরিকল্পনাবিহীন অনগ্রসর অর্থনীতিতে এই পদ্ধতির গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না।

জাপানের বিস্ময়কর অর্থনৈতিক প্রগতি নিয়ে শ্রী জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার মাদ্রাজের The Indian Review পত্রিকায় ১৯০১ সালের জুন সংখ্যায় লিখেছিলেন: "There is no country in the world whose modern history furnishes such valuable and extremely interesting object-lessons to India as Japan, which, within the last thirty years, has revolutionised her industrial conditions with an aptitude,

courage, foresight, as marvellous as have characterised her political revolution. Before the Restoration of 1869, Japan was industrially in the same mediaeval and backward state as India is at the present moment, but along with the political revolution an era of industrial revolution also was inaugurated, which upset her old indigenous system of industries. Japan's emergence from her isolation and her contact with the progressive nations of Europe were accompanied by radical changes in the habits and tastes of the people".

জাপান এবং ইংলণ্ডে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উত্তরণ-পর্ব আরম্ভ হয়েছিল তাতে প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক সাহায্যের অবদান ছিল না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরণ-পর্বে বৈদেশিক সাহায্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভারতের অবস্থা উনবিংশ শতাব্দীতে ছিল খুবই অনুন্নত। তবুও ভারতের কাঁচামালের একটি বড় অংশ বিদেশে চলে যেত; ভারতে তখন শিল্পোন্নয়নের কোনো প্রচেষ্টা ছিল না।

শুধু জাপান-ই নয়, ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে জার্মানী উনবিংশ শতাব্দীর শেষে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। স্বামীজী লিখেছেন: "আমেরিকা জার্মান-প্রবাহে অনুপ্রাণিত, লক্ষ লক্ষ জার্মান প্রত্যেক শহরে, ভাষা ইংরেজী হলে কি হয়, আমেরিকা আস্তে আস্তে 'জার্মানিত' (Germanised) হয়ে যাচ্ছে। জার্মানির প্রবল বংশবিস্তার; জার্মান বড়ই কষ্টসহিষ্ণু। আজ জার্মানি ইউরোপের আদেশ-দাতা সকলের ওপর। অন্যান্য জাতের অনেক আগে জার্মানি প্রত্যেক নরনারীকে রাজদণ্ডের ভয় দেখিয়ে বিদ্যা শিখিয়েছে; আজ সে বৃক্ষের ফল ভোজন করছে। জার্মানির সৈন্য প্রতিষ্ঠায় সর্বশ্রেষ্ঠ; জার্মানি প্রাণপণ করেছে যুদ্ধপোতেও সর্বশ্রেষ্ঠ হতে; জার্মানির পণ্য নির্মাণ ইংরেজকেও পরাভূত করেছে। ইংরেজের উপনিবেশেও জার্মান পণ্য, জার্মান মনুষ্য ধীরে ধীরে একাধিপত্য লাভ করছেন।"[৩] জার্মানীর বিস্ময়কর অগ্রগতিও স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে ভারতকে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে আগ্রহ স্বামীজী দেখিয়েছেন, তার পেছনে আমেরিকা, জার্মানী

৩। বিবেকানন্দ—বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড ১২৬ পৃঃ "পরিব্রাজক"।

ইংলণ্ড এবং জাপানের অভিজ্ঞতা অনেকটা কাজ করেছিল, এ-ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনগ্রসর দেশের শিল্পায়ন সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদগুলির সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তা-ভাবনার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। বরং বলা চলে, যদি আমরা বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা ধারাকে গ্রথিত করে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে রাখার চেষ্টা করি, তবে সেটা কোনো অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পথ-নির্দেশক হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। যে কোন অনুন্নত দেশেই দ্রুত শিল্পোন্নয়নের কার্যসূচী সফল করতে হলে তার পূর্ব শর্ত হিসাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ কৃষির উন্নয়ন না হলে শিল্পোন্নয়ন অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে কৃষি উন্নয়নের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষি-উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হল খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানো। বিশেষ করে গরীব দেশে সর্বাগ্রে খাদ্যাভাব দূর করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়লে বিদেশ থেকে খাদ্যসামগ্রীর আমদানি কমানো যায় এবং তাতে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার কিছু সাশ্রয় হয়। সেই বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা দেশের যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নেব কাজে লাগানো যায়; কারণ, তার সাহায্যে বিদেশ থেকে প্রয়োজনায় যন্ত্রপাতি (দেশে যেগুলির খুবই অভাব) আমদানি করা যায়। তাছাড়া, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়লে কৃষিক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে অথবা নিয়োজিত শ্রমের উৎপাদনী শক্তি বেড়েছে অথবা আরও বেশী জমি উৎপাদনের আওতায় এসেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিকল্পভাবে বলা যায়, উৎপাদনের মাত্রা বাড়তে থাকলে অধিকতর শ্রম-নিয়োগের সুযোগও বেড়ে যায়। গ্রামীণ বেকার সমস্যার চাপ তাতে কিছুটা প্রশমিত হয়। বিবেকানন্দ এই জিনিসটির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। সেজন্য তিনি দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়নে আগ্রহী হলেও সর্বাগ্রে খাদ্যাভাব দূর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছোট ছোট কৃষি-জোতে শ্রম-নিবিড় (Labour-intensive) উৎপাদন উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা বলেছিলেন। জাপানে যে দ্রুত শিল্পায়ন

হয়েছে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল, (১) কৃষি ও শিল্পের একই সঙ্গে উন্নয়ন (২) বৃহৎ শিল্প ও কুটির শিল্পের একই সঙ্গে উন্নয়ন, এবং (৩) রপ্তানি-চালিত উন্নয়ন (Export-led Development)। জাপানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ধারা বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেটা তার মনে একটি ছাপ রেখেছিল বলে আমরা ধারণা করতে পারি। কৃষি ও শিল্প যে পরস্পরের পরিপূরক, বিবেকানন্দ সে-কথা বলেছিলেন! ১৯৩০ সালের প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, তাতে কৃষি ও শিল্পের পরস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিবেকানন্দের চিন্তা ধারার উল্লেখ করা হয়েছে।

যে কোন অনগ্রসর দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য শিল্পায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। যন্ত্রশিল্পগুলি উন্নত হলে তায় যে কিছু পরিপূরক সুযোগ সুবিধা আছে, স্বামীজী তারও উল্লেখ করেছেন। যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য কাঁচামাল প্রয়োজন; তা আসবে কৃষিক্ষেত্র থেকে। আবার যন্ত্র শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীগুলির বাজার তৈরী করতে হবে দেশের ভেতরে ও বাইরে। দেশের অভ্যন্তরে বৃহৎশিল্পজাত সামগ্রীগুলির বাজার গড়ে তুলতে সময় লাগে; কেননা, এ-সব সামগ্রী কেনার মত ক্রেতার সংখ্যা বা জনগণের ক্রয়শক্তি বাড়াতে হবে। গ্রামে যাঁরা থাকেন তাঁদের ক্রয়শক্তি বাড়বে তখনই যখন তাদের জমিতে উৎপন্ন কৃষিজাত-সামগ্রীর একটি অংশ নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য রেখেও বাজারে বিক্রয়যোগ্য কিছু জিনিস থেকে যাবে। অর্থনীতির পরিভাষায় এটা হল বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত (Marketable surplus)। কৃষিক্ষেত্রে এই উদ্বৃত্ত বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত সামগ্রীর বাজারও বিস্তৃত হতে থাকবে। বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের দেশে যদি ইংলণ্ডের উৎপাদিত সামগ্রীর বাজার সীমিত করতে হয় তবে দেশে শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াতে হবে; এজন্য প্রয়োজন যন্ত্রশিল্পের দ্রুত বিস্তার। আবার যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হিসাবে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানো দরকার। আবার দেশের শিল্পজাত সামগ্রীর বাজার যদি বিদেশে সম্প্রসারিত করতে হয় অথবা বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে যদি দেশের শিল্পগুলিকে রক্ষা করতে হয় তবে উৎপাদনের মানও উন্নত করা দরকার, বিবেকানন্দ এটারও ইঙ্গিত

দিয়েছেন। আমেরিকা, জাপান ও জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর দেখেই বিবেকানন্দের এ-ধরনের চিন্তা-ভাবনা হয়েছিল, এটা মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে দেশের শিল্পায়ন সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতবাদ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা কোনো কেতাবী জ্ঞান নয়;—এই স্পষ্ট মতবাদের উৎস ছিল তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ। সেজন্যই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিবেকানন্দ যে-সব কথা বলে গেছেন সেগুলিকে আধুনিক উন্নয়ন-অর্থনীতির (Development Economics) কাঠামোর মধ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলে আমরা একটি সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক চিন্তা দেখতে পাই। অথচ, স্বামীজী ছিলেন সন্ন্যাসী। তিনি অর্থনীতির ছাত্রও ছিলেন না। কিন্তু, 'প্রতিভা এমনই জিনিস, সেটা যা কিছু স্পর্শ করে তাকেই সজীব করে।' বিবেকানন্দ ছিলেন একটি বিস্ময়কর প্রতিভা। জ্বলন্ত দেশপ্রেম, দেশের দুঃখ-দুর্দশার যন্ত্রণায় অধীর, এই সর্বত্যাগী মানব-প্রেমিক দেশকে অর্থনৈতিক প্রগতির পথে এগিয়ে যাবার যে উপায় নির্দেশ করেছিলেন, গভীরভাবে চিন্তা করলে সেটা আজও খুবই অর্থবহ। উন্নয়ন-অর্থনীতির আলোচ্যবস্তু এরকম বহু জিনিস হয়ত তাঁর বাণী ও রচনায় নেই, এবং সেটা না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সমস্যাটি কোথায় সেটা স্বামীজীর চোখে ধরা পড়েছিল।

শ্রমজীবীদের সম্পর্কে বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ শ্রমিক নেতা ছিলেন না। কিন্তু শ্রমিকদের সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা অতি আধুনিক চিন্তাবিদকেও বিস্মিত করবে। কার্ল মার্ক্সের দ্বারা স্বামীজী প্রভাবিত হননি ; কিন্তু মার্ক্সের মতবাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের মতবাদের কয়েকটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই। মার্ক্সের মতে উৎপাদনের একটি-ই উপাদান, এবং সেটি হল শ্রম। বিবেকানন্দ শ্রমকে উৎপাদনের মুখ্য উপাদান বলে মনে করেছেন এবং শ্রমিককে সমাজের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী বলে মনে করেছেন। শ্রমিকদের শোষণ করেই যে মালিকরা পুঁজিপতি হয় মার্ক্সীয় মতবাদের এটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ জিনিসটি স্বামীজীরও দৃষ্টি এড়ায়নি। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি পদে পদে যে শ্রমিকশ্রেণী শোষিত হচ্ছে, তাদের ন্যায্য মজুরি যে তারা পায়না, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিণতি হিসাবেই যে এই শ্রমিক-শোষণ এবং শেষ পর্যন্ত "স্বার্থপরতা ও অহমিকাপূর্ণ বর্তমান ধনিক সভ্যতার ধ্বংস যে অনিবার্য"—এই কথাটিও বিবেকানন্দ মনে-প্রাণে অনুভব করতেন। তবে মার্ক্সীয় মতবাদে যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের (Dialectical Materialism) কথা বলা হয়েছে স্বামীজীর বাণী ও রচনায় তা স্থান পায়নি। শ্রমজীবীদের সমস্যা নিয়ে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ছিল স্বতন্ত্র। শ্রমজীবীদের সম্পর্কে আলোচনায় বিবেকানন্দের যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা আমরা দেখতে পাই, তার জন্ম ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভেতর থেকে, —পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্র থেকে নয়। এই প্রসঙ্গে মার্ক্সীয় মতবাদে শ্রমিকদের স্থান কোথায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। মার্ক্সের মতে শ্রমিক যে কাজ করে তার দুটি সময় আছে, একটি হ'ল সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময় (Socially necessary labour-time) এবং হল অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময় (Surplus labour-time)। শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত সামগ্রী মালিক যে দামে বিক্রী করে শ্রমিক সেই পরিমাণ মজুরি পায় না। যতটা

মজুরি তাকে দেওয়া হয় সেটি হল সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময়ের দাম এবং যতটা মজুরি থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সেটি হল তার অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময়ের দাম। মালিকশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করে, প্রত্যেক শ্রমিককেই কিছু না কিছু শোষণ করা হয়; এই শোষণলব্ধ মুনাফা থেকেই হয় মূলধনের সঞ্চয় (accumulation of capital)। তার দুইটি পরিণতি তখন পরিলক্ষিত হয়। এক, মালিকশ্রেণীর হাতে যতই মূলধন সঞ্চিত হবে অপরদিকে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী ততই সংঘবদ্ধ হবে; দুই, মালিকদের মূলধন যতই বিনিয়োগ করা হবে, অতিরিক্ত শ্রমিকরা (Reserve Army of Labour) ততই কাজে নিযুক্ত হবে। পরে দেখা যাবে, যত বিনিয়োগ হচ্ছে সেই পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। তার ফলে মুনাফার হারও কমে আসছে। মুনাফার হার কমতে আরম্ভ করলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট এগিয়ে আসে এবং তখনই শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হয়ে মালিকশ্রেণীকে অপসারণ করে সমাজতন্ত্র অথবা সর্বহারাদের একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠা করে।

মার্ক্সীয় মতবাদের দুটি জিনিসের সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সাদৃশ্য দেখা যায়। এক, শ্রমিকরা যে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয় এবং এই শ্রমিক শোষণ যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিণতি,—একথা স্বামীজী বিশ্বাস করতেন। দুই, শ্রমিকদের যে সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, সেটি তিনি অনুভব করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, বিবেকানন্দের চিন্তাস্রোত যখন এভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল, তখন মার্ক্সীয় সাহিত্য বা রচনা এদেশে প্রচলিত হয়নি। ভারতের সমাজ ব্যবস্থাই ছিল বিবেকানন্দের চিন্তার উৎস। দেশের শ্রমিকরা যে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত এবং তারা যে শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে কাজ করেও শোষিত হচ্ছে, সেকথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ লিখছেন, "ঐ যারা চাষা-ভুষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতি বিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না।" স্বামীজীর এই উক্তি বর্তমানকালের বেগার খাটানো শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া আমাদের

দেশের ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও এই উক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার যে গভীরতা আমরা এখানে দেখতে পাই,—সমসাময়িক ভারতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে সেটা এভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। বিশেষ করে ভারতীয় শ্রমজীবীদের উদ্দেশে স্বামীজীর প্রশস্তি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে: "হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরাণ, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগ্‌দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে এ কথা। স্বামীজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের ওপর, সকলের পূজ্য, কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা। আমাদের গরীবেরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী!—তোমাদের প্রণাম করি।"[৪]

শ্রমিকদের শোষণ, মুখ বুজে তাদের অত্যাচার সয়ে যাওয়া স্বামীজীকে উদ্বেলিত করেছিল। তিনি জানতেন, এই শোষণের অবসান করতেই হবে। সেজন্য স্বামীজী বলছেন,"এমন সামাজিক অবস্থা কিন্তু চিরস্থায়ী হতে পারে না। একথা সত্য যে, কলকারখানা দ্রব্যাদি সুলভ করেছে, বৈষয়িক উন্নতি ঘটিয়েছে, কিন্তু কেউ ধনী হবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করবে, দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হবে, দলে দলে মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হবে—এ জিনিস

৪। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড 'পরিব্রাজক' পৃঃ ১০৬

চলতে পারে না। স্বার্থপরতা ও অহমিকাপূর্ণ বর্তমান ধনিক সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।"[৫] নূতন ভারতে শ্রমিক শোষণ থাকবে না, এটাই ছিল স্বামীজীর স্বপ্ন। যারা চিরকাল শ্রমিকদের শোষণ করে এসেছে, সেই উচ্চবর্ণের লোকদের স্বামীজী বলছেন, "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনাশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ।" কিন্তু কিভাবে এই শোষণহীন সমাজের সৃষ্টি হবে? বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, শ্রমজীবীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। বিপ্লবের কথা কার্ল মার্ক্সও বলেছিলেন। তবে কার্ল মার্ক্স শ্রমজীবীদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তার একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। মার্ক্সের উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব (Theory of Surplus Value) পুঁজিবাদী উন্নয়ন তত্ত্ব (Theory of Capitialist Development), শ্রেণী-সংগ্রাম তত্ত্ব (Theory of Class Struggle) এবং বিপ্লব তত্ত্ব (Theory of Revolution) সুবিদিত। মার্ক্সীয় অর্থনীতির অঙ্গ হিসাবে এই তত্ত্বগুলির তাৎপর্য সুগভীর। ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Materialistic Interpretation of History) মার্ক্সীয় তত্ত্বের ভিত্তি। বিবেকানন্দের নিজস্ব কোন অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা অর্থনৈতিক দর্শন ছিল না। তিনি অর্থনীতির তাত্ত্বিক প্রবক্তাও ছিলেন না। শ্রমজীবীদের সমস্যা ও অধিকার সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা

৫। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড 'পরিব্রাজক' পৃঃ ৮২

ভিত্তিক। তিনি শ্রমজীবীদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন। এভাবে নিষ্পেষিত শ্রমিকদের মুক্তির পথ কোথায়,—তা-ও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। স্বামীজী ছিলেন আশাবাদী। ভবিষ্যতে যে একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এটা যেন তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রমজীবীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। তিনি লিখছেন: "ভেবেছিলাম, আমেরিকা শ্রমিক সমস্যার সমাধান করবে। ভেবেছিলাম, সেখানে মানুষের অধিকার সাম্য রয়েছে। কিন্তু সে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। ধনীদের স্বার্থপরতা, বিশেষাধিকার বজায় রাখার চেষ্টা, একনায়কতা, আমেরিকাকে গ্রাস করেছে। পাশ্চাত্যসমাজ নরক বলে মনে হচ্ছে।

ভাবী অভ্যুত্থান ঘটবে রাশিয়ায় বা চীনে। বলতে পারি না, ঠিক কোথায়।

আমাদের শ্রমিক-সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর সংক্ষোভ, কী ভীষণ আলোড়নের মধ্য দিয়ে তা ঘটবে। জাতিবর্ণ একাকার হয়ে যাবে।" এক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু হল, রাশিয়ায় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার কুড়ি বছর আগেই স্বামীজী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে রাশিয়ায় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হতে পারে। শুধু তাই নয়, স্বামীজী চীনে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনার কথাও বলেছিলেন। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিপ্লব আমেরিকায় হতে পারে না এ কথা তাঁর মনে হল কেন? স্বামীজী তো জানতেন, মে দিবসের ঘটনাটি ঘটেছিল আমেরিকায়! তিনি তো ইংলণ্ডে বিপ্লব হওয়ার কথাও বলেননি! বিবেকানন্দ যতটা গভীর ভাবে জিনিসটি ভেবেছিলেন তার তুলনা নেই। তাঁর চিন্তাশক্তির স্বচ্ছতা অপরিসীম ছিল বলেই তিনি এই ধরনের ভবিষ্যৎ বাণী করতে পেরেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক অন্য কোন ভারতীয় চিন্তাবিদ শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে এভাবে চিন্তা করেন নি। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কুফল, শ্রমিক শোষণ, শ্রমিকদের বিপ্লব এই বিষয়গুলির চিন্তা করা মানব-প্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পক্ষেই সম্ভব ছিল। আমাদের দেশে প্রথম

৬। জনগণের অধিকার—পৃঃ ৮-৯।

শ্রমিক আইন প্রণীত হয় ১৮৮১ সালে; তার দশ বছর বাদে ১৮৯১ সালে প্রণীত হয় দ্বিতীয় শ্রমিক আইন। এই শ্রমিক আইনগুলি তৎকালীন ভারতীয় শ্রমিকদের যে সন্তুষ্ট করতে পারেনি তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল কয়েকটি শ্রম-বিরোধের মধ্যে। বোম্বের সুতাকলে প্রথম ধর্মঘট হয় ১৮৯২ সালে; ১৮৯৫ সালে বজবজ পাটকলেও ধর্মঘট হয়। ১৮৯০ সালে Bombay Mill-hands' Association বা বোম্বে মিল শ্রমিক সংস্থা গঠিত হয়। তবে এদেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন স্বামীজীর জীবদ্দশায় আরম্ভ হয়নি। স্বামীজী শ্রমিকদের সঙ্গে মিশতেন,—শুধু এদেশেই নয়, আমেরিকায়ও। মেরী লুই বার্ক তাঁর বইয়ে লিখেছেন: আমেরিকার মধ্যাঞ্চল পরিভ্রমণের সময় তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের অবস্থা জানার চেষ্টা করেছিলেন।[৭] নিজের দেশেও তিনি এভাবে শ্রমিকদের অবস্থা বোঝার এবং জানার চেষ্টা করতেন, এই ধারণা করা যেতে পারে।

ভারতের ইতিহাসেও যে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ছিল এবং ভারতের শ্রমজীবীরা যে যুগে যুগে শোষিত হয়েছে এই সত্যটি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। তবে এক্ষেত্রেও মার্ক্সের সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য দেখা যায়। মার্ক্স প্রদত্ত ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার (Materialistic interpretation of History) ভিত্তি হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম; মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনধারা তার অর্থনৈতিক জীবনেরই একটি প্রতিবিম্ব। সমাজের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। মার্ক্সীয় মতবাদে ইতিহাসের দিকে তাকালে বরাবরই একটি শ্রেণীসংগ্রাম দেখা যায়। প্রাচীনযুগে সমাজ ব্যবস্থার অভিজাত শ্রেণী ও ক্রীতদাস এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ছিল। মধ্যযুগের সংগ্রাম ছিল ভূম্যধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় এবং কৃষকদের মধ্যে; ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর সেই সংগ্রাম দেখা যাচ্ছে মালিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। যাদের কিছু আছে এবং যাদের কিছুই নেই তাদের মধ্যে একটি বিরোধ লেগেই আছে।

৭। Marie Louise Burke—Swami Vivekananda in America,—New Discoveries, Advaita Ashrama, Calcutta. P. 596.

বিবেকানন্দ তাঁর "বর্তমান ভারত" বইয়ে ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাসে যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ছিল তার বিশ্লেষণ করেছেন। মার্ক্স যেখানে বস্তুবাদকে অবলম্বন করে শ্রমজীবীদের মুক্তির উপায় নির্দেশ করতে চেয়েছেন, বিবেকানন্দ সেখানে অধ্যাত্মবাদের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন। 'বর্তমান ভারত' বইয়ে স্বামীজী দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিভাবে বিভিন্ন শ্রেণী পর্যায়ক্রমে পৃথিবীকে শাসন করেছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বহু আগেই বিবেকানন্দ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—শূদ্রের বা শ্রমজীবী মানুষের পৃথিবী শাসনের দিন আসছে, কোন শক্তিই তাকে রোধ করতে পারবে না। পৃথিবীতে শ্রেণী-শাসনের ইতিহাস সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্য হল :[৮] "পৃথিবীতে সাধারণ ভাবে গুণগত বর্ণ বা জাতি চারটি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। বিদ্যাচর্চা জ্ঞানচর্চা যারা করে, তারা ব্রাহ্মণ; যারা যোদ্ধা এবং দেশশাসন করে, তারা ক্ষত্রিয়; যারা ব্যবসায়ী, তারা বৈশ্য; আর যারা কায়িক শ্রমের দ্বারা ভোগ্য-বস্তু উৎপন্ন করে তারা শূদ্র।

"ইতিহাসের আদি অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ শাসন। ব্রাহ্মণেরা মানবসভ্যতার স্রষ্টিকারী। তাঁদের মস্তিস্কজাত জ্ঞানের দ্বারাই সভ্যতার সূচনা। তাঁরা অবসরভোগী বলে বুদ্ধিচর্চায় সমর্থ, তার ফলেই বিদ্যার উন্মেষ। ত্যাগ, তপস্যা ও বিদ্যায় এই ব্রাহ্মণেরা নমস্য। রাজশক্তি পর্যন্ত এই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিল।……দেবতাদের করুণাপ্রার্থী ক্ষত্রিয় রাজারা তাই ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ না হয়ে পারেননি। এই ব্রাহ্মণেরা আবার বুদ্ধিজীবী বলে মন্ত্রণায় ও চক্রান্তে অপরিহার্য। তাছাড়া তাঁরা শাস্ত্র ও সাহিত্য রচনা করেন। তাই রাজারা নিজের ও পিতৃপুরুষের নাম ইতিহাসে অক্ষয় করবার জন্যও ব্রাহ্মণের প্রসাদপ্রার্থী। "ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতশাসনে গুণের মতই দোষ যথেষ্ট। ব্রাহ্মণের শক্তি মানসিক; মনের জগৎ আলো-আঁধারির জগৎ। এই প্রহেলিকাময় জগৎ-ব্যাপারে প্রবঞ্চনার বহু সুযোগ থাকে। পুরোহিতদের শক্তি বস্তু নির্ভর নয়, জ্ঞান-নির্ভর; তাই তাঁরা নিজেদের আধিপত্যকে বজায়

৮। "জনগণের অধিকার"—বিবেকানন্দ-উক্তি সংকলন পৃঃ ৩-৭ বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' বই থেকে এইটি সংকলিত।

রাখার জন্য জ্ঞানকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে সচেষ্ট।...অর্থহীন আচার ও সংস্কারের প্রবর্তন ও সংরক্ষণের চেষ্টা তাঁরা করেছেন; অবিরত অপরের নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন, যে-কোন নূতন ভাবের বিরোধিতা করেছেন। তাছাড়া পরবর্তীকালে যখন জনসাধারণের কৃপার উপর তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে, তখন জনসাধারণ যা চেয়েছে, তারই পক্ষে তাঁরা ঈশ্বরের নামে বিধান দিয়েছেন।

"ব্রাহ্মণ শাসনের পরে ক্ষত্রিয় শাসন। ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগ থেকে মুঘল-যুগ পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি। ক্ষত্রিয় শাসনের সময়ে ঐহিক সভ্যতার খুব উন্নতি ঘটেছে। এই শাসনকালেই চারু ও কারুকলাসমন্বিত নাগরিক সভ্যতার বিকাশ।... সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় যখন সমাজগঠন ও শাসনের জন্য কেন্দ্রশক্তির প্রয়োজন হয়, তখন ক্ষত্রিয়শাসন সুফলপ্রদ। ক্ষত্রিয়েরা বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার পরিপোষক, দেশ থেকে কুসংস্কার দূরীকরণের প্রয়াসী। ক্ষত্রিয়রা যখন জ্ঞানচর্চা করেছেন, তখন সর্বোচ্চ তত্ত্ব তাঁদের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছে।...দেখা যায়, ধর্মাশোকের চেয়ে চণ্ডাশোকের, আকবরের চেয়ে আরংজীবের সংখ্যাই বেশী। ক্ষত্রিয়রা প্রজাদের ন্যায়সঙ্গত ভক্ষ্য মনে করতেন; তাঁরা অনেক সময়েই স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী, শোষণকারী ও বিলাসী।

"পরবর্তী শাসন বৈশ্যের। বৈশ্য শাসন ধনকেন্দ্রিক। পৃথিবীতে প্রথম বৈশ্য শাসন ইংরেজ-ই প্রবর্তন করেছে। প্রাচীনকালে টায়র, কার্থেজ, তার পরে ভেনিস প্রভৃতি বাণিজ্যপ্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য থাকলেও সেগুলিকে বৈশ্য রাজত্ব বলা চলে না, কারণ ঐ সকল স্থানে রাজপরিবারের লোকেরাই সাধারণ মানুষ বা দাসদের সাহায্যে বাণিজ্য করিয়ে উদ্বৃত্ত ভোগ করতেন। ইংরেজরা যে ভারতবর্ষ অধিকার করেছে, তা পাঠান-মোগলদের মত ক্ষত্রশক্তিতে নয়, বা বাইবেলের শক্তিতে নয়। ইংরেজের ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, সৈন্যবাহিনী, রাজসিংহাসনের আড়ম্বরের পিছনে আছে বাস্তব ইংলণ্ড, যার ধ্বজা—কলের চিমনি, যার বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবিপণি এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গীশ্রী। বৈশ্যশাসন সব কিছুই টাকায় কিনে নেয়।

ব্রাহ্মণের তপ-জপ-বিদ্যা-বুদ্ধি এবং ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র-শস্ত্র-তেজ-বীর্য সবই বৈশ্য অর্থের বলে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে। বিরাট কারখানাগুলি তার মৌচাক, অসংখ্য মক্ষিকার মত শূদ্রবর্গ তার মধ্যে অনবরত মধু সঞ্চয় করছে—বৈশ্য যথাকালে পিছন থেকে মধু নিংড়ে বার করে নেয়।

"বৈশ্য শাসনের প্রধান গুণ, তা পৃথিবীতে ভাবের ও বিদ্যার বিনিময় সম্ভব করে, কারণ বৈশ্য ব্যবসার জন্য সর্বত্র যায়।...বৈশ্য শাসনের দোষ—তার ভয়াবহ শোষণ, যদিও বাইরে প্রশান্ত ভাব। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শাসনে শোষণ সর্বাত্মক ছিল না—তা ব্যক্তিগত, পরিবারগত, বড় জোর গোষ্ঠীগত। কিন্তু বৈশ্যরা একটি বিরাট সম্প্রদায়, সুতরাং গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থে শোষণ করা হয়। আবার বৈশ্য শাসন যখন সাম্রাজ্যবাদী, তখন একটি গোটা জাতির স্বার্থে পরাধীন জাতিকে শোষণ করা হয়, যেমন ইংরেজ করেছে ভারতবাসীকে। ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি ভারত সাম্রাজ্যের উপর নির্ভরশীল বলে ইংরেজ যেন-তেন প্রকারে ঐ শাসন বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শাসনের পরে শূদ্রের বা কায়িক শ্রমজীবীর শাসনের পালা। এমন এক সময় আসবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হবে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের অধিকার পেয়ে শাসন করবে তা নয়, নিজেদের শূদ্রকর্ম বজায় রেখেই সমাজে একাধিপত্য পাবে। তারই পূর্বাভাস পাশ্চাত্য জগতে দেখা যাচ্ছে। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্, সেই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। ভাবী শূদ্র শাসনের গুণ—এই সময়ে সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা কমে আসবে।"

এখানে শূদ্র শাসন বলতে স্বামীজী শ্রমজীবীদের শাসনই ধরে নিয়েছেন, এটা কি সর্বহারাদের একনায়কত্বের-ই একটি দিক নয়? আবার স্বামীজী যখন বৈশ্য শাসনের কথা বলছেন, তা-কি অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের-ই একটি দিক নয়? এই প্রশ্নগুলি তোলার উদ্দেশ্য হল, এটা স্বীকার করে নেওয়া যে বিবেকানন্দের বিশ্লেষণ ছিল বিজ্ঞান সম্মত, ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা। শ্রমজীবীদের জন্য দেশের মার্ক্সবাদীদের দরদ

আমরা দেখেছি। কিন্তু আমাদের দেশের কতজন শ্রমিক দরদী বিবেকানন্দের দৃষ্টি নিয়ে শ্রমজীবীদের সমস্যার কথা ভেবেছেন? বিশ্ব-ইতিহাসে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বোঝাবার জন্য বিবেকানন্দকে কোন অর্থনৈতিক তত্ত্ব তৈরী করতে হয়নি। বাস্তব অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ এবং চিন্তার গভীরতা থেকেই তাঁর সত্যের অন্বেষণ। "বর্তমান ভারত" বইয়ে স্বামীজী দেখাবার চেষ্টা করেছেন—কিভাবে বিভিন্ন শ্রেণী পর্যায়ক্রমে পৃথিবীকে শাসন করেছে। সফল রুশ-বিপ্লবের বহু বছর আগেই স্বামীজী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—শূদ্রের বা শ্রমজীবী মানুষের পৃথিবী শাসনের দিন আসে, কোন শক্তিই তাকে রোধ করতে পারবে না, সুতরাং "বিবেকানন্দ কেবল ধর্মের প্রফেট নন, পৃথিবীর ইতিহাসে সমাজতন্ত্রেরও প্রফেট।"[৮]

শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বা শ্রমজীবীদের সমস্যা সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা আমরা দেখেছি। এখন শ্রম-বিভাগ সম্পর্কে বিবেকানন্দ কী বলেন তা আলোচনা করা যাক।

অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ বৃহদায়তন উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় শ্রম-বিভাগের (Division of Labour) কথা উল্লেখ করেছেন। সামগ্রিক ভাবে যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে শ্রম-বিভাগ অপরিহার্য বিবেকানন্দ তার আলোচনা করেছেন। আবার এই শ্রমবিভাগের যে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। তা-ও তার দৃষ্টি এড়ায়নি। বিশেষ করে শ্রম-বিভাগের ফলে যে কাজে একঘেঁয়েমি আসে তার উল্লেখ তিনি করেছেন। বিবেকানন্দ লিখেছেন, "মেলা কলকজা মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপাপত্তি করে জড়পিণ্ড তৈয়ার করে। কারখানায় লোকগুলো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, সেই একঘেয়ে কাজই কচ্চে—এক এক দলে এক একটা জিনিসের এক এক টুকরোই গড়ছে। পিনের মাথাই গড়ছে, সুতোর জোড়াই দিচ্চে, তাঁতের সঙ্গে এগু-পেছুই কচ্চে—আজন্ম। ফল,ঐ কাজটিও খোয়ানো, আর তার মরণ—খেতেই পায় না। জড়ের মত একঘেয়ে কাজ করতে করতে জড়বৎ বয়ে যায়।"[৯]

শ্রম-বিভাগে এই একঘেয়েমি ভাব থাকলেও সবার সমবেত চেষ্টায়-ই যে

৮। 'জনগণের অধিকার' বইয়ে শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু কর্তৃক লিখিত ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।

৯। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৭৪ "পরিব্রাজক"।

উৎপাদন-ব্যবস্থা চলে তার উল্লেখও বিবেকানন্দ করেছেন। জাহাজে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ লিখছেন, "এ জাহাজ করলে কে ? কেউ করেনি, অর্থাৎ মানুষের প্রধান সহায়স্বরূপ যে সকল কলকব্জা আছে, যা নইলে একদণ্ড চলে না, যার ওলট পালটে আর সব কল-কারখানার সৃষ্টি, তাদের ন্যায় সকলে মিলে করেছে।

যেমন চাকা; চাকা নইলে কি কোন কাজ চলে ?·· ··হ্যাঁকচ হোকচ গরুর গাড়ী থেকে জয় জগন্নাথের রথ পর্যন্ত, সুতো কাটা চরকা থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানার যন্ত্র পর্যন্ত কিছু চলে ? এ চাকা প্রথম করল কে ? কেউ করেনি, অর্থাৎ সকলে মিলে করেছে, প্রাথমিক মানুষ কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাঠছে, বড় বড় গুঁড়ি ঢালু জায়গায় গড়িয়ে আনছে, ক্রমে তাকে কেটে নিরেট চাকা তৈরি হল, ক্রমে সরা নাভি ইত্যাদি ইত্যাদি—আমাদের চাকা। কত লাখ বৎসর লেগেছিল কে জানে ?"[১০]

শ্রমিকদের সমবেত প্রচেষ্টায়-ই বৃহদায়তন উৎপাদন হতে পারে। কিন্তু কর্মক্ষমতা বাড়াবার জন্য শ্রমিকদের প্রয়োজন হল উপযুক্ত শিক্ষার, বিশেষ করে কারিগরী শিক্ষার। "বর্তমান ভারতে" বইয়ে স্বামীজী শ্রমজীবীদের আত্মশক্তি প্রয়োগের পথে বাধাগুলির উল্লেখ করেছেন:[১১] "এক, তাদের বিদ্যা নেই; দুই স্বজাতি বিদ্বেষের জন্য তাদের একতা নেই; তিন, তাদের বাসনা চিরদিনই নিষ্ফল হয়েছে বলে দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের অভাব, চার, ক্ষেত্র-বিশেষে (পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে) জাতিবিভাগ বংশগত না হয়ে গুণগত হওয়ার জন্য কোন শূদ্র বিশেষ গুণ বা প্রতিভা দেখালে সেখানে অন্য বর্ণগুলি তাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে নেয়, ফলে ঐ শূদ্রের গুণপনায় তার নিজ জাতি লাভবান হয় না। পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ঐ দোষগুলি দূর করে শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট।" এই বাধাগুলির গুরুত্ব এখনও আছে।

শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তা-ভাবনা এখানে যা আলোচিত হল, সেটি তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার একটি বিশেষ দিক। বিবেকানন্দের এই অর্থনৈতিক চিন্তা তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তারই একটি অঙ্গ।

১০। ঐ—পৃঃ ৬৯।

১১। 'জনগণের অধিকার' পৃঃ ১৫—১৬।

সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ নিজেকে সমাজতন্ত্রী বা "সোস্যালিস্ট" বলে অভিহিত করেছিলেন। "আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী (Socialist) তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'—এই হিসাবে।"[১] একথা ঠিক, বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য ধারণা অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নির্ভুল মনে করতেন না। তবুও তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে অভিহিত করেছেন। সমাজতন্ত্র ও সোস্যালিজম কথাটি প্রথম উদ্ভূত হয় ১৮৩৫ সালে যখন রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) "Association Of All Classes in All nations" নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। রামমোহন রবার্ট ওয়েনের মতবাদ জানতেন; বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৯ সালে রুশোর মতবাদের ওপর নির্ভর করে 'সাম্য' বইটি লিখেছিলেন। ১৮৭১ সালে কলকাতা থেকে কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি 'কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যালের' দপ্তরে চিঠি লিখেছিলেন।[২] তাঁরা বিবেকানন্দের পূর্বসূরী হলেও নিজেদের সমাজতন্ত্রী হিসাবে অভিহিত করেন নি, এদিক দিয়ে স্বামীজীর এই উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। মার্ক্সবাদীদের কাছে এটা বিস্ময়ের বস্তু যে মার্ক্স যে-সব কথা বলে গেছেন তার মধ্যে বহু কথাই স্বামীজী আগে বলে গেছেন। বিবেকানন্দ চাইতেন, দেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও নৈতিক উন্নয়ন। দেশের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট কোন সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী বিবেকানন্দ হয়ত দেননি। কিন্তু দেশের

১। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—সপ্তম খণ্ড পৃঃ ৩০২। মিস মেরী হেলকে লিখিত চিঠি।

"I am a Socialist not because I think it isa perfect system, but half a loaf is better than no bread". (Letters p. 380)

২। 'জনগণের অধিকার' বইয়ে শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভূমিকা।

জনগণকে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আমাদের শ্রমিক সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। সমাজতন্ত্র বিবেকানন্দের কাছে একটি সমাজ ব্যবস্থা এবং এই সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ থাকবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর মন্তব্যটি খুবই অর্থবহ, তিনি লিখছেন: "স্বামীজী তাঁর অসাধারণ ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন, ধর্মের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ধর্মের মূল কথাটা না বোঝার জন্যই এই বিরোধ। ধর্মে অবিশ্বাসী মানুষদের চেয়ে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের দায়িত্ব এর জন্য কম নয় বরং বেশী। ধর্মের বাহ্যিক কতকগুলি আচরণকে ধর্ম নাম দিয়ে ধর্মধ্বজীরা স্বার্থসিদ্ধি করে গেছে বহু যুগ ধরে। স্বামীজী বলেছেন, যদি এই অবস্থার পরিবর্তন না হয় তাহলে জনগণ যখন নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় উত্থিত হবে, তখন ধর্মকে বিসর্জন দেবে শোষণের যন্ত্র জ্ঞান করে। স্বামীজীর আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে রাশিয়া ও চীন ধর্মকে ঢাকিসুদ্ধ বিসর্জন দিয়েছে।"[৩]

স্বামীজী যে সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন, সেটা বর্তমান যুগের সমাজতন্ত্র থেকে পৃথক। মার্ক্সবাদীরা হয়ত বলবেন বিবেকানন্দের সোস্যালিজম লেনিন প্রদত্ত সংজ্ঞার সমান্তরাল নয়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবার কুড়ি বছর আগেই স্বামীজী "সর্বহারাদের একনায়কত্বের" কথা বলেছিলেন। "বর্তমান ভারত" বইয়ে স্বামীজী বলেছেন, "এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে।··· শূদ্র ধর্ম-কর্মসহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নাইহিলিজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।"[৪] এখানে শূদ্র বলতে স্বামীজী বুঝিয়েছেন শ্রমজীবী, মার্ক্সবাদীদের ভাষায় সর্বহারা

৩। ঐ।

৪। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড "বর্তমান ভারত" পৃঃ ২৪১

(Proletariat)। বিবেকানন্দের ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' বইয়ে[৫] লিখেছেন যে স্বামীজীর মার্কিন শিষ্যা ভগিনী ক্রিষ্টিন তাঁকে বলেছিলেন, "স্বামীজী শেষবারের মত আমেরিকা ভ্রমণে এসে নিউইয়র্কে একথাগুলো আমাদের বলেছিলেন। মেঝেতে পায়চারি করতে করতে স্বামীজী বলেছিলেন : 'প্রথম আসে ব্রাহ্মণের রাজত্ব, পরে এলো ক্ষত্রিয়দের। বর্তমানে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে বৈশ্যরা। এর পরেই আসবে শূদ্রের রাজত্ব। আমি জানিনা প্রথম শূদ্র রাষ্ট্র কোথায় প্রতিষ্ঠিত হবে। রাশিয়া কিংবা চীন একটিতে অবশ্যই হবে। এই দুটো দেশেই অগণিত জনসাধারণ পদদলিত ও শোষিত হচ্ছে।"[৫] স্বামীজী ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং এজন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে রাশিয়া কিংবা চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। পরবর্তীকালে এই দুটো দেশেই আমরা দেখতে পেয়েছি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। মিস মেরী হেলকে লিখিত চিঠিতে বিবেকানন্দ তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনার কথা লিখেছেন ; "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু, এ কি সম্ভব ?…প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।"[৫] যেহেতু বিবেকানন্দ নিজেকে সমাজতন্ত্রী হিসাবে অভিহিত করেছিলেন, সেজন্য বলা যায়, উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় মালিকানা, আয় ও ধনের সমান বন্টন এবং সবরকমের শোষণের অবসান,— প্রভৃতিতে তিনি বিশ্বাস রেখেছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসী অথচ সমাজতন্ত্রী (যেটা বর্তমান যুগে বিরল) বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, সব ধর্মীয় আন্দোলনেরই একটি অর্থনৈতিক পটভূমিকা থাকে। প্রত্যেক ধর্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ধারা বয়ে চলেছে। মানুষের উপরে ধর্মের

৫। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—স্বামী বিবেকানন্দ, (নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা) পৃঃ ৪।

৫। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—সপ্তম খণ্ড পৃঃ ৩০২।

কিছু প্রভাব আছে বটে, কিন্তু সে পরিচালিত হয় অর্থনীতির দ্বারা। কোন একটা ধর্মমত সর্বাঙ্গসুন্দর না হতে পারে, কিন্তু যদি তার পেছনে অর্থনৈতিক পটভূমিকা থাকে, এবং কিছু সংখ্যক উৎসাহী সমর্থক তার প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তাহলে একটি গোটা দেশকে ঐ ধর্মমতে নিয়ে আসা সম্ভবপর।"[৬]

"আমরা নির্বোধের মত জড়-সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করি। ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও মানতে হবে যে, ভারতের এক লক্ষ নরনারীর বেশী যথার্থ ধার্মিক লোক নেই। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকতে হবে এবং না খেয়ে মরতে হবে? কেন একজন লোকও না খেয়ে মরবে? বাহ্য সভ্যতা দরকার, যাতে দরিদ্র লোকদের জন্য নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। এখন ভারতে আধুনিক যুগ। কিভাবে জনগণের মধ্যে সেক্যুলার জ্ঞানের বিস্তার হয়, সেটাই গুরুতর প্রশ্ন।"[৭] সমাজতন্ত্রী ছিলেন বলেই বিবেকানন্দ ধর্মীয় আন্দোলনের অর্থনৈতিক পটভূমিকা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং জড় সভ্যতার যে জিনিসটি ভাল সেটা বরণ করে নিতে আগ্রহী ছিলেন।

সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দের চিন্তা-ভাবনা ও তাঁর দেশপ্রেম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেশেব বন্ধন মোচনের জন্য উদাত্ত আহ্বান, দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার জন্য যুবসমাজকে সক্রিয় করে তোলা, —এগুলির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল একটি শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য তাঁর স্বপ্ন। এক্ষেত্রে দেশ প্রেমিকদের প্রতি তাঁর আহ্বান এবং "বিশ্বাসঘাতক"-দের চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে তাঁর উক্তির উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"হে স্বদেশ হিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও, তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে? তোমরা কি অনুভব করছ, কোটি কোটি মানুষ

৬। জনগণের অধিকার পৃঃ ৬১

৭। ঐ ৬১-৬২ পৃঃ।

এখন অনাহারে রয়েছে, যুগ যুগ ধরে তারা অনাহারে রয়েছে? অনুভব করছ কি, অজ্ঞানের কালো মেঘ ভারতের আকাশকে আচ্ছন্ন করেছে? এই চিন্তা কি তোমাদের অস্থির করেছে, তোমাদের চোখের নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে? এই চিন্তা কি তোমাদের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে, শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছে, হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে তুলেছে?

"যাও, মহাবলি দাও, জীবনবলি দাও, তাদের জন্য—যাদের জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে অবতীর্ণ, যাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন—সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য।"[৮] বিবেকানন্দের এই বাণী বর্তমান মার্ক্সবাদী সমাজতান্ত্রিকদের কাছে হয়ত প্রেরণাদায়ক হবে না; কারণ তাঁদের সমাজ-তান্ত্রিক চেতনার প্রেরণা আসে বিদেশ থেকে। কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস করেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামিল হলেও সবচেয়ে বড় হল নিজের মাতৃভূমি,—যাঁদের কাছে মাতৃভূমির স্বার্থ-ই সর্বাগ্রে তাঁরা নিশ্চয়ই স্বামীজীর এই বাণী থেকে প্রেরণা পাবেন। চীনের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পরবর্তী-কালে মাও-সে-তুং কিন্তু চীনা জাতীয়তাবাদকে সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন।[৯] সমাজতন্ত্রের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের যে বিরোধ নেই—স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনা তারই সাক্ষ্য বহন করে। স্বামীজী দেশবাসীকে মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন,—একটি উচ্চবিত্ত এবং অন্যটি নিম্নবিত্ত, অর্থাৎ, একটি উচ্চজাতি অথবা জীবনে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী (Haves) এবং অপরটি দরিদ্র, অবহেলিত শূদ্র শ্রেণী (Have-nots)। এই শ্রেণী সংঘাতকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং এভাবে বিশ্বাসঘাতকের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, "লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষালাভ করে এবং

৮। ঐ ৪২ পৃঃ।

৯। মাও-সে-তুঙ-এর মতে মার্ক্সবাদকে তখনই কার্যকর করা সম্ভব যখন জাতীয় চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটবে এবং সেই তত্ত্ব একটা দেশের জাতীয় আকৃতির রূপ পরিগ্রহ করবে। (Report to the Sixth Plenary Session of the Sixth Central Committee of the Party—October 1938) Selected Writings of Mao-Tse-tung. P. 23.

বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও যারা ঐ দরিদ্রদের কথা একটিবার চিন্তা করবার অবসর পায় না—তাদের আমি বিশ্বাসঘাতক বলি। যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক অজ্ঞানে ডুবে থাকবে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না—এমন প্রত্যেকটি লোককে আমি দেশদ্রোহী মনে করি। যতদিন ভারতের ত্রিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মত হয়ে থাকবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক দেখিয়ে বেড়াবে—আমি তাদের পামর বলি।[১০]

বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মূল ভিত্তি ছিল মানুষের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধ হল জীবে প্রেম,—এই প্রেম স্বাভাবিক-ভাবে এসেছিল একটি মমত্ববোধ থেকে। সমাজতন্ত্রের মূল কথাগুলি হল, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিলোপ এবং সমুদয় সামাজিক সুবিধা ও অর্থনৈতিক শক্তির সম বন্টন। বিবেকানন্দ মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য মেনে নিতে চাননি। এই সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল অধ্যাত্মবাদ। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন সব মানুষই অমৃতের পুত্র,—সবাই পূর্ণতার অধিকারী। যুব সমাজের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান ছিল, "কোন অন্যায় সুবিধা চেয়ো না, সকলের জন্য সমান সুযোগ চাই। যুবকবৃন্দ, তোমরা সামাজিক উন্নয়নের বাণী ছড়িয়ে দাও, সাম্যের বাণী প্রচার কর।"[১১] (No privilege for anyone, equal chance for all. The youngmen should preach the gospel of social raising up, the gospel of Equality.")

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর "স্বামী বিবেকানন্দ" বইয়ে বলেছেন, আজকাল সামান্য মার্ক্সবাদ-জানা তরুণরা স্বামীজীকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' রূপে অভিহিত করে থাকেন। তাঁর জীবদ্দশাতেও সমাজ সংস্কারক কর্মীরা তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করতেন, কারণ, তিনি একথা প্রচার করতেন না যে বিধবা বিবাহের

১০। ঐ ৪৪ পৃঃ।

১১। শ্রী সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী "বিবেকানন্দ ও সোস্যালিজম" "বিশ্ববিবেক" বই থেকে সংকলিত। (বাকসাহিত্য, কলিকাতা)

ব্যবস্থা অসবর্ণ বিবাহ ও অনুরূপ সমাজ সংস্কার কার্যের দ্বারাই ভারতের নবজাগরণ সম্ভব হবে। তাঁর কাছে এটা সে-সময়ে জরুরী প্রয়োজন মনে হয়নি। তাঁর মতে প্রয়োজনীয় কর্তব্য ছিল জনগণের উন্নতি বিধান। তাদের শিক্ষিত করে তোলা এবং অনগ্রসর মনে মানবসমাজে তাদের উন্নীত করা।"[১১]
যাঁরা বিবেকানন্দকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' মনে করেন, তাঁরা শুধু তাঁকেই যে বুঝতে পারেন নি তা নয়,—সমাজতন্ত্রের আদর্শ কী তা-ও তাঁদের পুরোপুরি বোধগম্য নয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীতে কোন ধারণা ছিল না,—কারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে তখন কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা, বঞ্চিত ও অবহেলিত গরীবদের জন্য উন্নততর জীবনযাত্রা সুনিশ্চিত করা, সমাজ থেকে আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূর করে সবাইকে সমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ দেওয়া এবং সমাজ থেকে সব রকমের শোষণ দূর করা,—তবে বলতে হয়, ভারতীয়দের মধ্যে বিবেকানন্দই প্রথম এই কর্মসূচী গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বামীজী জনগণের জন্য সমানাধিকার চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "যাঁরা বলেন, অজ্ঞ বা গরীবদের ধনসম্পদ ইত্যাদিতে পূর্ণ অধিকার দিলে, এবং ধনী-সন্তানদের মত তাদের সন্তানদের জ্ঞানার্জনের ও উন্নতি করবার সমান সুবিধা দিলে তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে—তাঁরা কি সমাজের কল্যাণের জন্য সেকথা বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হয়ে বলেন? ইংলণ্ডে বলতে শুনেছি, ছোটলোকেরা লেখাপড়া শিখলে আমাদের চাকরগিরি করবে কে? "মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞানের অন্ধকারে অভাবের নরকে ডুবে থাকুক—তাদের টাকা হলে বা তারা বিদ্যা শিখলে উচ্ছৃঙ্খল হবে!! সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তারা, না তুমি আমি, এই দশজন বড় জাত!!!

"কর্ম অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া সমাজের স্বভাব। সে ভাগ থাকবে, কিন্তু চলে যাবে বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি। সামাজিক

১১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—"স্বামী বিবেকানন্দ" (নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা) পৃঃ ১০।

জীবনে আমি বিশেষ এক ধরনের কাজ করতে পারি, তুমি অন্য ধরনের কাজ করতে পারো। তুমি না হয় দেশ শাসন করো, আমি না হয় জুতো সারি। কিন্তু তাই বলে তুমি আমার চেয়ে বড় হতে পারো না, আমার মাথায় পা দিতে পারো না। তুমি খুন করে প্রশংসা পাবে আর একটা আম চুরি করলে আমাকে ফাঁসি যেতে হবে—এমন হতে পারে না। এই অধিকার তারতম্যকে প্রচণ্ড আঘাত করে উঠিয়ে দিতে হবেই। আমরা চাই—কারও কোন বিশেষ অধিকার থাকবে না, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির সমান সুযোগ থাকবে।"[১১] স্বামীজীর আগে মানুষের সমান অধিকার নিয়ে এত স্পষ্ট কথা আর কেউ বলেন নি। এজন্য তিনিই আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের প্রফেট। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতে ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র কার্ল মার্ক্সের বই থেকে জন্ম নেয়নি, বিবেকানন্দের চিন্তায় আবির্ভূত।[১২] মানুষের সমান অধিকার নিয়ে বিবেকানন্দ যা বলেছেন তাই ভারতের যুব-সমাজকে দিয়েছে প্রেরণা এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ। বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতের উচ্চবর্ণের লোকেরা নিজেদের সংশোধন না করলে শ্রেণী-সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রে আমরা যে শ্রেণী-সংঘর্ষ দেখতে পাই সেটি হল পুঁজিপতি বা মালিক শ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংঘর্ষ। বিবেকানন্দের মতে যারা নিম্নজাতি, যেমন চাষা-ভূষো, মুচি-মুদ্দেফরাস—তাদের কার্যতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা উচ্চ-বর্ণের চেয়ে ঢের বেশি। তাঁরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধনধান্য উৎপন্ন করছে। এরা শীঘ্রই উচ্চবর্ণের উপরে উঠে যাবে।"[১৩] এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন: "শ্রমজীবীরাই জাতির মেরুদণ্ড—সব দেশে। তারা কাজ বন্ধ করলে উচ্চবর্ণের অন্নবস্ত্রের উপায় থাকবে না। জীবন সংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকার জন্য নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি, কলের মত তারা এতদিন একইভাবে কাজ করে এসেছে। আর বুদ্ধিমান চতুর লোকে তাদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে। সকল দেশেই

১১। ঐ পৃঃ ২৬-২৭

১২। 'জনগণের অধিকার' বইয়ে শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভূমিকা, পৃঃ ৯

১৩। জনগণের অধিকার,—পৃঃ ২৫

এরকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই, নিম্নজাতিরা ক্রমে ঐ জিনিস বুঝতে পেরেছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্যগণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকায় তারা জেগে উঠে লড়াই আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও উচ্চজাতরা নিম্নজাতদের দাবাতে পারবে না। এখন নিম্নজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই উচ্চজাতদের কল্যাণ। তা না করলে ঘরাঘরি লাঠালাঠি করে উচ্চজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। জনগণ যখন জেগে উঠবে, যখন উচ্চবর্ণের অত্যাচার বুঝতে পারবে, তখন তাদের ফুৎকারে উচ্চবর্ণ কোথায় উড়ে যাবে। তাই বলি, নিম্নজাতির মধ্যে বিদ্যাদান ও জ্ঞানদান করে তাদের ঘুম ভাঙাতে উচ্চবর্ণ সচেষ্ট হোক। তা করলে ওরা যখন জাগবে—একদিন জাগবে নিশ্চয়ই—তখন উচ্চবর্ণের উপকার বিস্মৃত হবে না, কৃতজ্ঞ বোধ করবে।”[১৪] স্বামীজীর এই বাণী থেকে এটাই বোঝা যায় যে শ্রেণী সংগ্রাম যে হবেই এবং তার ফলে নিম্নজাতির-ই (বা সর্বহারা) যে জয়লাভ হবে এরকম ধারণা তিনি পোষণ করতেন। স্বামীজীর জীবদ্দশায় ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আরম্ভ হয়নি বটে, তবে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা তখন চলছিল। এই ধরনের প্রচেষ্টার সঙ্গে স্বামীজীর পরিচিতি ছিল বলে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর “স্বামী বিবেকানন্দ” বইয়ে উল্লেখ করেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, স্বামীজী যখন ইউরোপে গিয়েছিলেন, পিটার ক্রপট্‌কিন্‌ তখন লণ্ডনে নিয়মিত জীবন যাপন করছেন (প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে স্বামীজীর সঙ্গে ক্রপট্‌কিনের সাক্ষাৎ হয়েছিল স্বামীজীর আমেরিকান শিষ্যা শ্রীমতী ওলিবুলের মধ্যস্থতায়), প্লেখানভের দল তখন খুব সক্রিয়। অবশ্য লেনিন তখনও তাঁর দল ত্যাগ করেননি। প্যারিসে স্বামীজী ও ক্রপট্‌কিনের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছিল কেউ জানেন না। তাঁরা মাত্র একবারই মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর কতিপয় পাশ্চাত্য শিষ্য ক্রপট্‌কিনের একান্ত অনুরাগী ও সুহৃদ ছিলেন।

১৪। ঐ পৃঃ ৩৬—বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা নবম খণ্ড, ১০৭ পৃঃ

১৫ "স্বামী-শিষ্য-সংবাদ" থেকে সংকলিত, পৃঃ ১০৮-১০৯

এই লেখকের কাছে তাঁরা ক্রপট্‌কিনের কথা খুবই বলতেন। স্বামীজী ক্রেপট্‌কিনের আলোচনায় প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এমন কথা বলা যায় না; কিন্তু তিনি সভ্যজগতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছিলেন। বিভিন্ন মতাদর্শের বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয়ও হয়েছিল। তাই তিনি যে আধুনিক বিশ্বের সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিজের দেশের সমস্যাবলী বিচার করেছিলেন সে সম্পর্কে বিস্ময়ের কিছুই নেই।"[১৫]

বিবেকানন্দ ছিলেন সবরকম শোষণের বিরোধী। নতুন ভারত গঠন করার জন্য স্বামীজী চেয়েছিলেন নিম্নজাতির লোকদের সুশিক্ষিত করে তুলতে যাতে একটি 'সর্বহারা সংস্কৃতি' গড়ে ওঠে। তাঁর কল্পনায় ছিল এমন একটি শোষনহীন সমাজ যা সংকার্ণ সম্প্রদায়িক হবে না। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জনসাধারনকে একটি ঐক্যবদ্ধ সংস্থায় সম্মিলিত করা একমাত্র এই নতুন সংস্কৃতি দ্বারাই সম্ভব বলে স্বামীজী বিশ্বাস করতেন,—তাঁর মতে এই সংস্কৃতির কোন শ্রেণীগত বা সম্প্রদায়গত রূপ থাকবে না।[১৬] আজ যখন দেশে বিচ্ছিন্নতা-বাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তখন বিবেকানন্দের এই শ্রেণীবিহীন ও সম্প্রদায়বিহান সর্বহারা সংস্কৃতির দিকে আমরা তাকাতে পারি। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বিবেকানন্দ এই বিষয়ে আমাদের অনেক আগেই সতর্ক করে দিয়ে গেছেন,—তিনি দেখিয়ে গেছেন কোথায় রয়েছে একটি সুখী সমাজের সন্ধান। বিবেকানন্দ জানতেন মানুষের বৈষয়িক অভাব না মেটাতে পারলে তাকে দিয়ে কোনো মহৎ কাজ করানো সম্ভব নয় বা কোনো উচ্চতর আদর্শ বা চিন্তাও গড়ে তোলা সম্ভব নয়। একমাত্র বিবেকানন্দের পক্ষেই সম্ভব ছিল একথা বলা: "যে ভগবান আমাকে অন্ন দিতে পারে না তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না।"[১৬]

বিবেকানন্দ জানতেন পূর্ণ সাম্য অর্জন করা সম্ভব নয়। মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু যে জিনিসটি অর্জন করা সম্ভব সেটা হল বিশেষা-

---

১৫। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—স্বামী বিবেকানন্দ, (নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা) পৃঃ ৫।

১৬। ঐ পৃঃ ৭

ধিকারের বিলোপ। বিবেকানন্দ বলেছেন: "কিন্তু কী অর্জন করা যাবে? —বিশেষাধিকারের বিলোপ। সমস্ত পৃথিবীর সামনেই এই হল যথার্থ কাজ। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির সামাজিক জীবনে অধিকার বিলোপের ঐ এক সংগ্রামই চলেছে। একদল লোক অপরের তুলনায় স্বভাবতঃই বেশী বুদ্ধিমান্ —এই পার্থক্য সমস্যার বিষয় নয়। সমস্যা হল—ঐ বুদ্ধিমান মনুষ্যগোষ্ঠী তাদের বুদ্ধি শক্তির জোরে অল্প বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে দৈহিক ভোগ্যবস্তু পর্যন্ত অপহরণ করে নেবে কি না। লড়াই সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে। শারীরিক ভাবে কেউ অপরের তুলনায় অধিক বলশালী, তার দ্বারা সে দুর্বলকে দমিত বা পরাভূত করতে পারবে—এতো স্বতঃস্বীকৃত ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে তারা এই জীবনের সকল সুখের সামগ্রী কেবল নিজেদের জন্যই সংগ্রহ ও সঞ্চয় করবে—এ কিন্তু নীতিবিরোধী ব্যাপার। সংগ্রাম এরই বিরুদ্ধে। কিছু লোক স্বাভাবিক সামর্থ্যের দ্বারা অন্যের তুলনায় অধিক সম্পদ সংগ্রহে সমর্থ হবে, এতো স্বাভাবিক। কিন্তু ধনার্জনের এই শক্তির দ্বারা তারা অসমর্থদের উপর পীড়ন চালাবে, তাদের পদদলিত করবে—এটা নীতিসম্মত নয়। সংগ্রাম এরই বিরুদ্ধে। অন্যকে বঞ্চিত করে নিজে সুবিধা ভোগ করার নামই অধিকারবাদ। এবং যুগ যুগ ধরে নীতিধর্মের লক্ষ্য—এই অধিকারবাদকে ধ্বংস করা। বৈচিত্র্যকে নষ্ট না করে সাম্য ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ।"[১৭]

এই অধিকারবাদই হল ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নীতি। স্বামীজী এই অধিকারবাদকে বিলোপ করতে চেয়েছেন। যে বিশেষাধিকারের বিলোপ তিনি চেয়েছেন তা বিশেষ করে অর্থনৈতিক অধিকারকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সমাজ-তন্ত্রী বিবেকানন্দ এক্ষেত্রে পুরোপুরি-ই সমাজতন্ত্রী। ধর্মীয় জীবনে যেমন তিনি অধিকারবাদের বিরোধী, সে প্রকার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনেও সবরকম বিশেষাধিকারের তিনি বিরোধী। মার্ক্সবাদের উদ্দেশ্যর সঙ্গে এই চিন্তাধারার পার্থক্য খুব কম। স্বামীজী বাস্তব জীবনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে নিজের

১৬। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সপ্তম খণ্ড ১০৯ পৃঃ

১৭। জনগণের অধিকার—পৃঃ ৬০

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে সত্য-কে ঘোষণা করেছেন তাতে তাঁকে আধুনিক সমাজতন্ত্রের পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য করা যায়। প্রকৃতই তিনি "সমাজতন্ত্রের প্রফেট"। সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ মার্ক্সবাদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। মার্ক্সবাদও পরবর্তীকালে লেনিন এবং মাও-সে-তুঙের হাতে সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু ভারতে স্বামীজী-ই প্রথম সমাজতন্ত্র প্রচার করেছিলেন,—এবং এই সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ মার্ক্স-লেনিন-মাও-সে-তুঙের মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র। স্বামীজী ধর্মকে অস্বীকার করেননি। সব মানুষই তাঁর কাছে সমান, কারণ "যত্র জীব তত্র শিব"। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পেছনে যে ইতিহাস-চেতনা থাকা দরকার, তা স্বামীজীর ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন, ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে ছেড়ে উন্নত হতে পারে না। কিন্তু গণতন্ত্র বলতে স্বামীজী কী বোঝাতেন? তিনি ইংলণ্ডের সংসদীয় গণতন্ত্রের বা মার্কিনী গণতন্ত্রের ত্রুটি উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে স্বামীজীর উক্তি: "ও তোমার 'পার্লেমেণ্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম; ভোট ব্যালট মেজরিটি দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।"[১৭] অন্যত্র তিনি বলছেন, "সামাজিক বা রাজনীতিক সর্ববিধ বিষয়ে সফলতার মূলভিত্তি—মানুষের সততা। পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ কোন আইন দ্বারা কখন কোনো জাতি উন্নত বা ভাল হয় না। কিন্তু সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলি উন্নত ও ভাল হইলেই জাতিও ভাল হইয়া থাকে।"[১৮] দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি শুধু পার্লামেণ্টের আইনের দ্বারা অর্জিত হয় না। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করার আগে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে ভাল নয়, এই চেতনা জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া দরকার। উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্পৃহা জাগরিত করতে হবে। এক শ্রেণীর বিশেষাধিকার লোপ করে সমাজের যা কিছু ভাল তা যে সমানভাবে দেশবাসীকে ভোগ করতে হবে এই চেতনা জাগাতে হবে। "আজকাল গণতন্ত্র এবং সাম্যের কথা সকলেই বলে থাকে, কিন্তু একজন যে আর একজনের

১৭। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩১ পৃঃ

১৮। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা নবম খণ্ড ৪৪২ পৃঃ

সমান, এ-কথা সে জানবে কি করে? এজন্য তার থাকা চাই—সবল মস্তিষ্ক এবং আজে-বাজে ধারণা থেকে মুক্ত স্বচ্ছ একটি মন।"[১১] সেজন্য সর্বাগ্রে চাই শিক্ষা, দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তাদের সামাজিক চেতনা বাড়বে; নিজেদের সামাজিক দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধেও তারা সচেতন হবে। তখনই সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের তাৎপর্য তারা বুঝতে পারবে।

সাম্যবাদ সম্পর্কে বিবেকানন্দের যুক্তির দার্শনিক ভিত্তি ছিল অদ্বৈতবাদ। আমাদের শাস্ত্রেই আছে সাম্যবাদের মহান বাণী, আর সমাজব্যবস্থায় আছে ভেদাভেদ, উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নজাতির উপর অধিকার কায়েম করার প্রচেষ্টা।—বিবেকানন্দ সমাজব্যবস্থা থেকে এই ভেদাভেদ দূর করতে চেয়েছিলেন। এই ভেদাভেদ দূর হলে যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, তার ভিত্তি হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এখানেই পাশ্চাত্য সাম্যবাদীদের সঙ্গে বিবেকানন্দের পার্থক্য। সাম্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো নিয়ে স্বামীজী আলোচনা করেননি বটে,—তবে সাম্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আদর্শ কী হবে তা স্বামীজীর কল্পনায় ছিল। সেজন্যই তিনি অধিকারবাদের বিরোধী ছিলেন এবং সমাজ থেকে সব রকম শোষণ ও বিশেষাধিকার দূর করতে চেয়েছিলেন।

দারিদ্র্য দূরীকরণ, কৃষি-উন্নয়ন, দেশের শিল্পায়ন, প্রভৃতি বিষয়ে বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার যে মূলধারা আমরা দেখেছি, তার সঙ্গে সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে আছে। বিবেকানন্দের প্রতিটি চিন্তা একই সূত্রে গ্রথিত। দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে হবে, অশিক্ষার অন্ধকার দূর করতে হবে এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে, অনাহার থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে হবে, দেশে কৃষি ও শিল্পের প্রসার করতে হবে,—যেদিকেই তাকাই না কেন, সবদিকেই দেখতে পাই মানবদরদী বীর সন্ন্যাসীর আহ্বান,। "ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী,

১১। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা অষ্টম খণ্ড ৩২২ পৃঃ

ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"[২০] এই দেশপ্রেমের তুলনা নেই। বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা, সামাজিক চিন্তা, সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ সবই তাঁর অতুলনীয় দেশপ্রেমের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। তিনি মহান দেশপ্রেমিক ছিলেন বলেই দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তা তাঁকে সর্বদা যন্ত্রণায় জর্জরিত করত। তিনি মহান মানবপ্রেমিক ছিলেন বলেই নিজেকে সমাজতন্ত্রী হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। তিনি মানুষকে ভাল-বাসতেন বলেই দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করা ও অশিক্ষা দূর করার জন্ম আকুল আহ্বান জানিয়েছিলেন ; এজন্যই তিনি মানুষ গড়ার মিশন হাতে হাতে নিয়েছিলেন। আর্তের সেবা ও ত্রাণ রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ; এটা বিবেকানন্দেরই শিক্ষা। তিনি ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীদের বলেছেন : "আমরা এই কয়েক মিলিয়ন সন্ন্যাসী গণসমূহের (Masses) জন্য কি করেছি ? তাদের দর্শনশাস্ত্র শেখাই। একজন বুভুক্ষু লোককে ধর্ম শেখান অর্থ তাকে পরিহাস করা মাত্র। কি করে এই লক্ষ লক্ষ লোক উঠবে, কি করে তারা সমাজের কল্যাণ করবে যখন তারা বুভুক্ষা পীড়িত ?"[২১]

এখনও ভারত পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। শুধু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করে বা উৎপাদনের উপাদানের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়, জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে,—তাদের অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে

২০। বিবেকানন্দ "বর্তমান ভারত" বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪৭ পৃঃ
২১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—"স্বামী বিবেকানন্দ" ৩৪০ পৃঃ

দেওয়া সম্ভব হবে এবং আমরা স্বামীজীর নির্দেশিত সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে পারব।

'সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দ' আলোচনা প্রসঙ্গে মার্ক্স ও বিবেকানন্দের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে মার্ক্সীয় তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আরও দু-একটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে।[২২] স্বামী বিবেকানন্দের নাম যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও কিছু লোকের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে তাতে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনেও বিবেকানন্দ-চর্চা সুরু হয়েছে। মার্ক্স ও বিবেকানন্দ দুজনেই নিপীড়িত মানুষকে শোষণমুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু দুইজনের পথ স্বতন্ত্র। মস্কোর ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান ষ্টাডিজের পরিচালক ডক্টর ওয়াই চেলিসভের উক্তি :

" many years will pass, many generations will come and go. Vivekananda and his time will become the distant past, but never will there fade the memory of the man who all his life dreamed of a better future for his people.···Together with the Indian people, Soviet people who already know some of the works of Vivekananda published in the USSR, highly revere the memory of the great Indian patriot, humanist and democrat, impassioned fighter for a better future for his people and all mankind."[২৩]

মার্ক্স এবং বিবেকানন্দের মতবাদ বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্ক্সের সমাজতন্ত্র যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলি হল, দ্বন্দ্ববাদী ও ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, শ্রেণী-সংগ্রাম, উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব, বিপ্লব-তত্ত্ব এবং সর্বশেষে সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। মূলধন বা

পুঁজির সাহায্যে সমাজের স্বরূপচ্যুতির (alienation) যে ব্যাখ্যা মার্ক্স করেছেন, তার চারটি দিক হল, (১) শ্রমিক যত বেশী পরিশ্রম করছে ততই সে শোষিত হচ্ছে এবং পুঁজিপতিদের জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য ও মুনাফার সৃষ্টি করছে, (২) শ্রমিক নিজে যে জিনিস উৎপাদন করছে সেটি সে নিজের ভোগে লাগাতে পারছে না, সেটি যাচ্ছে পণ্যরূপে অন্যের ভোগে। পুঁজিপতিরাই সেটি ভোগ করে। (৩) যেহেতু শ্রমিক তার শ্রমের মূল্য পাচ্ছেনা এবং যেহেতু তার সৃষ্ট বস্তু পণ্যরূপে অন্যের ভোগে যাচ্ছে সেজন্য শ্রমিক ক্রমশঃ নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে এবং সেজন্য তার মনের মধ্যে এক অবহেলিত দাসত্বের ভাব সৃষ্ট হয়। (৪) শ্রমিকের চোখে তার মালিক সর্বময় নিষ্ঠুর কর্তা এবং অন্যান্য শ্রমিকেরা হতভাগ্য ক্রীতদাস মাত্র।[২৪] মার্ক্সের মতে এই স্বরূপচ্যুতির মূল কারণ সমাজে অর্থনৈতিক শোষণ। বিবেকানন্দ যে অর্থনৈতিক শোষণের কথা বলেননি তা নয়, শ্রমিকরা যে তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত, শ্রমজীবীরা যে প্রতিপদে অবহেলিত, তারা যে নিজের কাজের মর্যাদা পায় না বা তাদের পরিশ্রমে যে যে জিনিস উৎপাদিত হয় সেগুলি যে উচ্চবর্ণের লোকদের ভোগের কাজে লাগে,—এ কথা তিনি বহুবার বলেছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়া অন্য ধরনের শোষণের কথা বিবেকানন্দ বলেছেন এবং সেটিও যে স্বরূপচ্যুতির কারণ তা-ও বলা যেতে পারে। স্বামীজী বলেছেন: "বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার ধারনা মনুষ্যজীবনের কলঙ্কস্বরূপ। ...প্রথমে আসে পাশব সুবিধার ধারণা—দুর্বলের উপর সবলের অধিকারের চেষ্টা। এই জগতে ধনের অধিকারও ঐরূপ। একটি লোকের অপরের তুলনায় যদি বেশী অর্থ হয়, তাহা হইলে যাহারা কম অর্থশালী সে তাহাদের উপর একটু অধিকার স্থাপন বা সুবিধা ভোগ করিতে চায়। বুদ্ধিমান

ব্যক্তিদের অধিকার লিপ্সা সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী। যেহেতু একটি লোক অন্যদের তুলনায় বেশী জানে শোনে, সেইজন্য যে অধিকতর সুবিধার দাবি করে। সর্বশেষ এবং সর্বনিকৃষ্ট অধিকার হইল আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার।...যাহারা মনে করে যে, আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহারা বেশী জানে, তাহারা অন্যের উপর অধিকতর অধিকার দাবি করে।... কিন্তু বৈদান্তিক কাহাকেও শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোনরূপ অধিকার দিতে পারেন না, একেবারেই নয়।"[২৫] স্বামীজীর দৃষ্টিতে শোষণের চারটি রূপ ধরা পড়েছে[২৬] যথা, (১) জ্ঞানবলে বা বুদ্ধিবলে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার (২) অস্ত্রশক্তিতে বলবান ব্যক্তিদের অত্যাচার, (৩) অর্থ-শক্তিতে সম্পদশালীর অত্যাচার এবং (৪) কায়িক শ্রমের শক্তিতে অত্যাচার।

স্বামীজী মানবসমাজে ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের শাসন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এবং বলেছেন, ভবিষ্যতে শূদ্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যেকটি বর্ণের শাসন-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, এবং তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে,"[২৭] কিন্তু সব দুর্দশার মূলে হল শিক্ষার অভাব, তাই স্বামীজীর উক্তি: "সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে—সত্যিকার জাতি, যাহারা কুটীরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।...পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারনা জন্মিয়াছে যে ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইতেই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব বোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।"[২৮]

২৫। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৩৩৫-৬ (প্রথম সংস্করণ)

২৬। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ—"নতুন পৃথিবীর সন্ধানে মার্ক্স ও বিবেকানন্দ" চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ পৃঃ ৬১০

২৭। পত্রাবলী ২য় ভাগ, পৃঃ ১৬৪

২৮। ঐ প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৭৪

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা ছিল সুগভীর। তাঁর "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" এবং "বর্তমান ভারত" এই বই দুটির মধ্যে বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ইতিহাস-ভিত্তিক ব্যাখ্যা আমরা খুঁজে পাই। স্বামীজী উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নজাতের সংঘাত বা শ্রেণী-সংঘাতের কথা বলেছেন; কিন্তু তাঁর কাছে এই শ্রেণী-সংগ্রাম সম্ভাব্য মনে হলেও অনিবার্য মনে হয়নি। স্বামীজীর মতে বিপ্লব কারোরই একচেটিয়া দায়িত্ব নয়; বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে দেশের তরুণ সম্প্রদায়। কিন্তু মার্ক্সবাদীদের মতে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় শ্রমিক এবং কৃষকরা। স্বামীজীর বিপ্লব চিন্তার প্রথম কথাই হল মানুষ গড়ে তোলা।

দেখা যাচ্ছে, সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্ক্স বা মার্ক্সীয় মতবাদের বিস্তর পার্থক্য। মার্ক্সবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে,—কারণ তার পেছনে আছে রাষ্ট্রীয় শক্তির আনুকূল্য এবং রাজনৈতিক সংগঠন ও সংগঠনিক শৃঙ্খলা। বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন দলীয় কাঠামো বা রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের মধ্যে এটি আবদ্ধ নয়। বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক চিন্তা, যদিও আধুনিককালের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে বিবেকানন্দের অর্থ নৈতিক চিন্তার কাঠামোগত মিল দেখতে পাওয়া যায় না। তার কারণ, বিবেকানন্দ অর্থনীতিবিদ বা অর্থনীতির তাত্ত্বিক ছিলেন না। ব্যবহারিক বেদান্তের (Practical Vedanta) উপর ভিত্তিশীল ছিল তাঁর চিন্তাধারা, এবং তা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা।

বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা ও সমাজচিন্তার সমন্বয়

বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা সামগ্রিকভাবে তাঁর সমাজচিন্তারই একটি অঙ্গ। তিনি নিজে অর্থনীতিবিদ ছিলেন না। সুতরাং তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই। সমাজের উন্নতির জন্য তাঁর সব ভাবনা চিন্তার মধ্যে প্রধান ছিল দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তা। আমরা বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার কয়েকটি দিক আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি দেশের দারিদ্র্য এবং গরীবদের দুর্দশা দেখে বিবেকানন্দ কী মানসিক যন্ত্রণা-ই পেতেন। দারিদ্র্যের কারণগুলি তিনি বিশ্লেষণ করেছেন; কিভাবে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করে দেশ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করা যায় সে চিন্তাও তাঁর বাণী ও রচনায় আমরা পেয়েছি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমজীবীদের ভূমিকা নিয়েও স্বামীজী আলোচনা করেছেন। আমরাও পরিচিত হয়েছি তাঁর সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার সঙ্গে তাঁর সমাজচিন্তার সম্পর্ক খুবই নিবিড়। তাঁর সমাজচিন্তার দুটি বিশেষ দিক আছে। একটি হল কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতা বর্জন সম্পর্কে বিবেকানন্দের আহ্বান এবং অপরটি হল দেশে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা। অথচ ভারতের মত দেশে সামাজিক প্রগতির জন্য এই দুটির গুরুত্ব অপরিসীম। আর সামাজিক প্রগতি না হলে অর্থনৈতিক প্রগতি সুদূরপরাহত। যে কোনো অনগ্রসর দেশের অর্থতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হল তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, এবং সেই ক্ষেত্র তৈরী হয় শিক্ষা ও সমাজ-চেতনার দ্বারা।

অস্পৃশ্যতার মূলে বিবেকানন্দ কশাঘাত করেছেন। কারণ তিনি জানতেন দেশ থেকে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ দূর না হলে, কুসংস্কার থেকে দেশবাসীকে মুক্ত না করতে পারলে সামাজিক প্রগতির শর্ত পূরণ হবে না এবং দেশকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি কখন হবে? যখন দেশের গরীবতম ব্যক্তিও বুঝতে পারবে যে সমাজে তার একটি বিশেষ

স্থান আছে, যখন তার এই চেতনা হবে যে সে-ও সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে তারও সমান অধিকার আছে,—তখনই অর্থনৈতিক প্রগতির প্রচেষ্টার সঙ্গে সে নিজেকে সামিল করবে। বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী,—তাঁর কাছে সব মানুষই অমৃতের সন্তান; সকল জীবই তাঁর কাছে শিব। ভারতে জনগণের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার তাঁকে শুধু ব্যথিত-ই করেনি,—তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই অত্যাচারের শেষ না হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কোন আশা নেই। নিপীড়িত ও অত্যাচারিত মানুষের জন্য বিবেকানন্দের মর্মবেদনা আমরা দেখতে পাই তাঁর উক্তিতে: "ভারতে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকেদের, পতিতদের, কি চোখে দেখে থাকি? তাদের কোন উপায়ই নেই, রাস্তা নেই, সাহায্যকারী বন্ধু নেই। সে যতই চেষ্টা করুক, উঠবার উপায় নেই। তারা দিন দিন ডুবছে। রাক্ষসের মত নৃশংস সমাজ তাদের উপরে ক্রমাগত যে আঘাত করছে, তার যন্ত্রণা তারা পাচ্ছে, কিন্তু জানে না, কোথা থেকে ঐ মার আসছে। তারাও যে মানুষ, তারা তা ভুলে গেছে।

"যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা-ভরসা নেই, সে গেল। কি অত্যাচার! গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় দু'টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রদের সাহায্য করবার কয়টা সভা আছে? ক'জন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ী-ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পারো? তোমরা তাদের ছোঁও না, দূর্ দূর্ করো। ঐ যে হাজার হাজার সাধু-ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করেছেন? খালি বলছেন, 'ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না'। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়—কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই—এখন ভাতের হাঁড়িতে।

"'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকবে? যারা এক টুকরো

রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দেবে। যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে পবিত্র করবে কি? আবার ভণ্ডামি, ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নাই—ভোগ সাঙ্গ হলেই স্নান, কেন না, ব্রাহ্মণেতর জাতি অপবিত্র। এক শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণ-বদমাস দেশটা উৎসন্ন দিয়েছে। এরা আবার ধর্মের প্রচারক। পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলবে 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।'

"যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু ও ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, এবং তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ, না নরক। সে ধর্ম, না পিশাচ-নৃত্য।

"এই অত্যাচারের ফলে ভারতের এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হয়ে গেছে। মুসলমানদের ভারতাধিকার দরিদ্র ও পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হয়েছিল। ভারতবর্ষে দরিদ্রদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী কেন? একথা বলা মূর্খতা যে, কেবল তরবারির জোরে তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়। বস্তুতঃ জমিদার ও পুরোহিতদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই তারা ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিল। সেইজন্য বাংলাদেশে, যেখানে জমিদারদের বিশেষ সংখ্যাধিক্য, সেখানে কৃষকদের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান বেশী।

"পাদরীরা লাখ লাখ লোককে মাদ্রাজে খ্রীষ্টান ক'রে ফেলছে। ত্রিবাঙ্কুরে পৌরোহিত্যের অত্যাচার সবচেয়ে বেশী। সেখানে ব্রাহ্মণগণ একচ্ছত্র ভূস্বামী।

"আর এধারে আমাদের দেশে যারা এখনকার গণ্যমান্য, কিছুতে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে শোক, তাপ, দৈন্য ও পাপের কাতর শব্দে ভারতের আকাশ আকুল—তাতেও তাদের দিবাস্বপ্নের ব্যাঘাত হয় না।

"এই জাতি ডুবছে। সাধারণ মানুষের অভিশাপ আমাদের মাথার উপরে। অমৃতনদী পাশ দিয়ে বয়ে গেলেও আমরা তাদের নর্দমার জল পান করতে দিয়েছি, স্তরে স্তরে খাদ্য সাজানো থাকলেও তাদের অনশনে মরতে দিয়েছি, মুখে অদ্বৈতবাদের কথা বলেছি, সকলেই নাকি এক ব্রহ্মের বিকাশ,

কিন্তু একই সঙ্গে প্রাণপণে তাদের ঘৃণা করেছি।"[২২]

অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, পুরোহিতশ্রেণীর অত্যাচার নিম্নজাতের লোকদের যথাযথ সামাজিক স্বীকৃতি না দেওয়া এবং ধর্মান্ধতা, আমাদের সামাজিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করেছে। সামাজিক প্রগতির পথ রুদ্ধ হলে অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উন্নয়নের উত্তরণ-পর্বের সূচনার সঙ্গে সামাজিক জীবনের পরিবর্তন ও বিকাশের যোগাযোগ থাকে। স্বামীজীর দৃষ্টিতে এটি ধরা পড়েছিল। সেজন্য তিনি সবরকমের সামাজিক বৈষম্য দূর করার ওপর প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গরীব-দুঃখীদের কথা যে কেউ ভাবে না, স্বামীজী বহু জায়গায় তাঁর এই মর্মবেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন। রামকৃষ্ণ মঠে তিনি গরীবদের থাকার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। স্বামী-শিষ্য সংবাদে দেখতে পাই, বিবেকানন্দ শিষ্যকে বলছেন, "গরীব দুঃখীদের জন্য well ventilated (বায়ু চলাচলের উপযুক্ত) ছোট ছোট ঘর তৈরী করতে হবে। এক এক ঘরে তাদের দু-জন তিন-জন মাত্র থাকবে। তাদের ভালো বিছানা, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় সব দিতে হবে। তাদের জন্য একজন ডাক্তার থাকবেন।...সেবাশ্রমটি অন্নসত্রের ভেতর একটি ward (বিভাগ)-এর মতো থাকবে, তাতে রোগীদের শুশ্রূষা করা হবে। ক্রমে যখন fund (টাকা) এসে পড়বে, তখন একটা মস্ত Kitchen (রন্ধনশালা) করতে হবে। অন্নসত্রে কেবল 'দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতান্' এই রব উঠবে। ভাতের ফেন গঙ্গায় গড়িয়ে পড়ে গঙ্গার জল সাদা হয়ে যাবে। এই রকম অন্নসত্র হয়েছে দেখলে তবে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।"[২৩]

একদিকে উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নজাতিকে শোষণ করার প্রচেষ্টা দেখে ক্ষোভ এবং অপরদিকে দীন-দুঃখীদের হাতে দু-মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার আকুতি,—এই দুটি জিনিসের সমন্বয় আমরা স্বামীজীর মধ্যে দেখতে পাই। তাঁর অর্থ-

২২। জনগণের অধিকার পৃঃ ১৬-১৭

২৩। স্বামী-শিষ্য-সংবাদ (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা) ১২৮ পৃঃ

নৈতিক চিন্তা-ভাবনার একটি বড় দিক হল এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে।

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে তমসা থেকে মুক্ত করে আলোর পথে নিয়ে যেতে হলে দেশে রজোগুণের বিস্তার করা প্রয়োজন বলে স্বামীজী মনে করতেন। সেজন্য তিনি শিষ্যকে বলেছেন: "আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম, এদেশের মতো এত অধিক তামস প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাইরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভেতরে একেবারে ইট-পাটকেলের মতো জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে? এমন অকর্মা, অলস, শিশ্নোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় কতদিন আর বেঁচে থাকতে পারবে? ও দেশ (পাশ্চাত্য) বেড়িয়ে আগে দেখে আয়, পরে আমার প্রতিবাদ করিস। তাদের জীবনে কত উদ্যম, কত কর্মতৎপরতা, কত উৎসাহ, কত রজোগুণের বিকাশ। তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে, ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না, সর্বাঙ্গে Paralysis (পক্ষাঘাত) হয়ে যেন এলিয়ে পড়ছে। আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই। কি হবেরে জড় পিণ্ডগুলো দ্বারা। আমি নেড়েচেড়ে তাদের ভেতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কাজে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে-গাঁয়ে দেশে-দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শোনাগে। সকলকে ধরে ধরে বল্‌গে যা—তোরা অমিত বীর্য, অমৃতের অধিকারী। এইভাবে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর্—জীবন সংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর্, তারপর মুক্তিলাভের কথা তাদের বল্। আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করা। উত্তম অশন-বসন, উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তারপর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পারবে তা বলে দে। আলস্য, হীন-বুদ্ধিতা, কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে। বুদ্ধিমান লোক এ দেখে কি স্থির থাকতে পারে? কান্না পায়? মাদ্রাজ, বম্বে, পাঞ্জাব, বাঙ্গলা—যেদিক চায়,

কোথাও যে জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি না। তোরা ভাবছিস—আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুণ্ডু শিখেছিস? কতকগুলি পরের কথা ভাবান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভেতরে পুরে পাশ করে ভাবছিস, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা!! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকীল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরানিগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরি—এই তো। এতে তোদেরই বা কি হ'ল, আর দেশেরই বা কি হল? একরার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে। তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?—কখনই নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর্—চাকরি গুখুরি করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে। ঐ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ তৎপর হতে উপদেশ দিই।

"অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি করছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্র ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনা। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্ম কথায় কেউ কান দেবে না। তাই বলি—আগে আপনার ভেতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর, তারপর দেশের ইতর সাধারণ সকলের ভেতর যতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে প্রথম অন্নসংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে তাদের শেখা। আর বসে থাকবার সময় নেই। কখন কার মৃত্যু হবে, তা কে বলতে পারে? "ঐরূপ কর্মতৎপরতা ও আত্মনির্ভরতা কালে দেশে আসবেই আসবে—বেশ দেখতে পাচ্ছি; There is no escape (গত্যন্তর নেই);...ঠাকুরের জন্মাবার সময় হতেই পূর্বাকাশে অরুনোদয় হয়েছে; কালে তাঁর উজ্জ্বল ছটায় দেশ মধ্যাহ্ন সূর্যকরে আলোকিত হবে।[২৪]

বিবেকানন্দের কাছে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আগে গরীবদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা,—অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হলে ধর্ম লাভের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২৪। স্বামী-শিষ্য-সংবাদ (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা) ১৬৩-১৬৫ পৃঃ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও এই মতই পোষণ করতেন। "খালি পেটে ধর্ম হয় না"—এই সত্যটা দেশের লোকদের বোঝার বা বোঝাবার খুব দরকার ছিল। বিবেকানন্দ সারা দেশ ঘুরে দেশের যে দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্য লক্ষ করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি দেশবাসীকে আত্মনির্ভর করে তুলতে চেয়েছিলেন। এজন্য শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন ছিল শুধু তা-ই নয়,—"পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে", অর্থাৎ, প্রযুক্তি বিদ্যার সম্প্রসারণ করে দেশকে জাগাতে হবে যাতে দেশবাসী দেশের উন্নয়নের চেষ্টা করতে পারে। যে-কোন উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় জনগণকে সামিল করার প্রয়োজন। বর্তমানে দেশে যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চলছে তা-ও সফল হতে পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ তার সঙ্গে নিজেকে জড়িত না করেছে। যে-কোন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য এই mass involvement খুব প্রয়োজনীয়। বিবেকানন্দ এটা বুঝতে পেরেছিলেন। দেশের যুবকদের তিনি ব্যবসা করতেও উপদেশ দিতেন যাতে একদিকে স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থাও (Self-employment) হয়, অপরদিকে দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। স্বামীজী শিষ্যকে বলছেন—"একবার বেরিয়ে আয়—দেখবি ভারতেতর দেশে লোকের জীবন প্রবাহ কেমন তরতর করে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর তোরা কি করছিস? এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মতো 'চাকরি দাও, চাকরি দাও' বলে চেঁচাচ্ছিস। জুতো খেয়ে খেয়ে—দাসত্ব করে করে তোরা কি আর মানুষ আছিস। তোদের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। এমন সজলা সফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে ধন ধান্য প্রসব করছেন, সেখানে দেহধারণ করে তোদের পেটে অন্ন নেই, পিঠে কাপড় নেই। যে দেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর অন্য সব দেশে civilisation বিস্তার করেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দশা? ঘৃণিত কুকুর অপেক্ষাও যে তোদের দুর্দশা হয়েছে। তোরা আবার তোদের বেদবেদান্তের বড়াই করিস্। যে-জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ করে, সে জাতের আবার বড়াই। ধর্মকর্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিস জন্মায়। বিদেশী লোক সেই raw

material (কাঁচা মাল) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মতো তাদের মাল টেনে মরছিস। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশ বিদেশের লোক তাই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিস তয়ের করে বড় হয়ে গেল ; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে 'হা অন্ন, হা অন্ন' করে বেড়াচ্ছিস।

"টাকা না জোটে তো জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দেশী কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা-ইউরোপে পথে পথে ফেরি করবি। দেখবি—ভারত-জাত জিনিসের এখনও কত কদর। আমেরিকায় দেখলুম, হুগলি জেলার কতকগুলি মুসলমান ঐরূপে ফেরি করে করে ধনবান্ হয়ে পড়েছে। তাদের চেয়েও কি তোদের বিদ্যাবুদ্ধি কম? এই দেখনা—এদেশে যে বেনারসী শাড়ি হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় নিয়ে আমেরিকায় চলে যা। সে দেশে ঐ কাপড়ে গাউন তৈরি করে বিক্রী করতে লেগে যা, দেখবি কত টাকা আসে।"

দেশের হস্তজাত শিল্পের কদর যে বিদেশে আছে, স্বামীজী এটা জানতেন এবং সেজন্য যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে স্ব-নিয়োজিত কর্মসংস্থানের জন্য তিনি হস্তজাতশিল্পের সম্প্রসারণের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

দেশের উন্নতির একটি সর্বপ্রধান শর্ত হল, শিক্ষার প্রসার,—বিবেকানন্দ এই জিনিসটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নিম্নজাতিকে সর্বাগ্রে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বিবেকানন্দের মতে "চণ্ডালের বিদ্যা-শিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক। কারণ প্রকৃতি যাহাকে স্বভাবতঃ প্রখর করেন নাই,তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে।"[২৫]

অন্যত্র বিবেকানন্দ বলেছেন' "তাই তো বলি, তোরা এই mass-এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে 'তোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ ; আমরা তোমাদের ভালবাসি, ঘৃণা করিনা'।

ঐ ১০৪-১০৫ পৃঃ।

২৫। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সপ্তম খণ্ড ৭৬ পৃঃ

তোদের এই sympathy পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গুরুত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে।"[২৬] নিম্নজাতের লোকেরা শিক্ষিত হয়ে উঠলেই যে তাদের জাত-ব্যবসা ছেড়ে দেবে তা নয়। বরং বিবেকানন্দ মনে করতেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম যাতে আরও ভাল করতে পারে", তারা সেই চেষ্টা করবে; জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে, জেলে জেলেই থাকবে, চাষা চাষই করবে।"[২৭] বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা যে কোন তাত্ত্বিক চিন্তা নয়, একথা আমরা আগেই দেখেছি। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা সমাজচিন্তারই একটি বিশেষ দিক। দেশের সামাজিক জীবনের দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, প্রভৃতি তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং তা থেকেই আমরা পাই তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা। শিক্ষা-বিস্তারের ওপর তিনি এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন এজন্য যে এটি শুধু যে সামাজিক প্রগতির জন্য অপরিহার্য তা-ই নয়,—অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও অপরিহার্য। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি উপাদান হিসাবে শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন. তাঁদের মতে শিক্ষা যে শুধু সামাজিক প্রগতির জন্য অপরিহার্য তা-ই নয়। শিক্ষা-বিস্তারের মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, জীবনযাত্রা সবই উন্নত হয় তা-ঠিক। কিন্তু এটিও মনে রাখতে হবে, শিক্ষা বিস্তারের একটি অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে। যতক্ষণ দেশের কিশোর কিশোরী অথবা যুবক-যুবতীরা শিক্ষাগ্রহণে ব্যস্ত থাকবে ততক্ষণ তাদের একটি কর্ম-নিয়োগের সুযোগ হল। শিক্ষা শেষ করার পর তারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। দেশের অর্থনৈতিক সঙ্গতির ভিত্তিতে আগে স্থির করতে হবে, কী ধরনের কাজের জন্য কী পরিমাণ শিক্ষিত কর্মীর চাহিদা থাকবে, আর সেই শিক্ষার গুণগত বা মানগত মর্যাদা কী হওয়া দরকার। দেশের জনসম্পদই বা কত। জনসমষ্টির কত শতাংশকে কর্মে

২৬। স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ১০৮ পৃঃ

২৭। ঐ ১০৯ পৃঃ

নিয়োগ করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন একটি জনশক্তি পরিকল্পনা (Man-power Planning) এবং একটি শিক্ষা পরিকল্পনা (Education Planning)। বিবেকানন্দ শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছিলেন, সেগুলিকে আমরা এভাবে তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারি। বিবেকানন্দ যখন শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য আকুল আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন শিক্ষিত লোকেরই অভাব ছিল, শিক্ষিত লোকের বেকার-সমস্যা ছিল না। সুতরাং তখন দেশের লক্ষ লক্ষ মূর্খ লোককে শিক্ষিত করে তুলতে পারলেই তাদের কাজের ব্যবস্থা হত, অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা হত এবং তাদের দারিদ্র্য দূর হত, —বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনার এটি একটি দিক। সেজন্য তিনি চেয়েছিলেন, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরী শিক্ষা এবং শ্রমশিল্প প্রসারের অনুকূল বিবিধ শিক্ষার বিস্তার।

"বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া ভারতের নিজস্ব জ্ঞান ভাণ্ডারের বিভিন্ন বিষয়ের সহিত ইংরেজী ভাষা এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আয়ত্ত করা আমাদের প্রয়োজন। আর চাই কারিগরী শিক্ষা এবং শ্রমশিল্প প্রসারের অনুকূল বিবিধ শিক্ষার বিস্তার।"[২৮]

অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শিক্ষার আবশ্যকতা যে শুধু যুবকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বিবেকানন্দ তা মনে করতেন না। বিবেকানন্দ নারীশক্তির জাগরণের কথাও বলেছেন। তাঁর মতে "মেয়েরা প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক, যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে।"[২৯] শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না,—বিবেকানন্দ এটা বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে "নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।...আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা-লাভে সমর্থ।"[৩০]

২৮। স্বামী বিবেকানন্দ—ভারত-কল্যাণ, অনুবাদ ও সংকলন—স্বামী নির্বেদানন্দ অষ্টম সংস্করণ, রামকৃষ্ণ মিশন, কলকাতা স্টুডেন্টস হোম, পৃঃ ৬৮।

২৯। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা দশম খণ্ড ৩০৯ পৃঃ।

৩০। ঐ নবম খণ্ড ৪৭৯ পৃঃ।

বিবেকানন্দের সমাজচিন্তার যে-কয়টি দিক আমরা এখানে আলোচনা করলাম,—যেমন, অস্পৃশ্যতা বর্জনের আহ্বান, শিক্ষার সম্প্রসারণ করা, নারী জাতিকে সুশিক্ষিত করে তোলা প্রভৃতি—সেগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে-কোন প্রচেষ্টা জড়িত। এটি যে শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা নয়; —যে-কোন দেশেই সামাজিক সাম্য ও শিক্ষার সম্প্রসারণ না হলে উন্নয়নের সূচনা হতে পারে না। বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা তাঁর এই সমাজ চিন্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতের সামাজিক অবস্থার দুর্দশা লক্ষ করেই তিনি তার অর্থনৈতিক বন্ধনমুক্তির আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই কাজ এখনও অসমাপ্ত। আমাদের অর্থনীতির যাঁরা কর্ণধার তাঁরা যদি বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতেন এবং তার বাস্তব দিকটি গ্রহণ করতে সচেষ্ট থাকতেন, তবে হয়ত আমাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা এত তীব্র হত না। যারা সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক নীতি তৈরী করেন, এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের কথা বলেন, তাঁরা কি কখনও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার কথা ভেবেছেন? আমাদের দেশের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ কোথায়,—তার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ বিবেকানন্দ যে-ভাবে করেছেন, সেভাবে কোন দেশনেতাই করেননি। মার্ক্সীয় নীতির পুরোপুরি অনুসরণ করাও ভারতে সম্ভব নয়। অথচ মার্ক্সবাদের মধ্যে যে জিনিসটি সত্য, সেটি কিন্তু বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। বিবেকানন্দ যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা চেয়েছিলেন,—তার ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তিনি যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তা ছিল সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক সাম্য; কিন্তু সেই সাম্যাদর্শের ভিত্তি ছিল অদ্বৈতবাদ ও বেদান্ত দর্শন। মানুষ অমৃতের পুত্র,—সব মানুষই সমান,—মানুষকে নরোত্তম করাই আসল কথা নয়, মানুষকে নারায়ণ রূপে গ্রহণ করাই আসল কথা। এর জন্য চাই অপার সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবে দেশের তরুণ সম্প্রদায় যাদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত"।

উপসংহার

বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার মূল সূত্রগুলি হল: এক, ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মানুষের দারিদ্র্য, অনাহার, অর্ধাহার ও অপুষ্টি, এবং এই দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের সমস্যার সমাধান না করতে পারলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। দুই, দেশে কৃষির উৎপাদন বাড়ানো এবং কৃষকদের দুঃখ কষ্ট দূর করা ও তাদের বেগার খাটানো বন্ধ করা খুবই জরুরী। তিন, দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে, কারণ শিল্পোন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে দেশের দুর্গতি মোচন করা সম্ভব হবে না। চার, দেশের শ্রমজীবীরা খুবই গরীব ও অবহেলিত; তাদের ন্যায্য মজুরি তারা পায় না। শ্রমজীবীদের শোষণ করেই একশ্রেণীর লোক ধনী হয়েছে। উচ্চবর্ণ ও নিম্নজাতের লোকদের মধ্যে সংঘাত লেগেই আছে এবং এই সংঘাত থেকেই শোষণের সৃষ্টি। একটি শোষণহীন সমাজ গঠন করাই বিবেকানন্দের স্বপ্ন, তবে এক্ষেত্রে শোষণহীন সমাজ ও শ্রমজীবীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার পন্থা বিবেকানন্দের নিজস্ব চিন্তাধারা-প্রসূত; মার্ক্সীয় চিন্তাধারার প্রভাব বিবেকানন্দের উপর ছিল না, অথবা তিনি মার্ক্সবাদী ছিলেন না। পাঁচ, বিবেকানন্দ নিজেকে সমাজতন্ত্রী হিসাবে অভিহিত করেছেন। বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র এক নয়; যদিও এই দুইয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। সমাজের কোনো শ্রেণীর বিশেষাধিকার লোপ করা এবং সবার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সমানাধিকার সুনিশ্চিত করাই বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দেশের শিল্পোন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে হলে এবং শিল্পে নিয়োজিত জনসংখ্যার পরিমাণ বাড়াতে হলে আগে কৃষি-উৎপাদন বিশেষ করে কাঁচামাল উৎপাদন ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানো দরকার কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে হলে সর্বাঙ্গীণ গ্রামীণ উন্নয়নের প্রয়োজন। দেশে যেখানে মূলধনের অভাব এবং শ্রমের প্রাচুর্য দেখা যায়, সেখানে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে সুশিক্ষিত করে

তোলা দরকার। বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে তাদের পরিচিত করা দরকার। বিবেকানন্দ এ জিনিসটি ভেবে দেখেছিলেন। আমাদের কৃষি-ব্যবস্থার ওপর চাপ কমাবার উদ্দেশ্যে শিল্পোন্নয়নের ওপর আরও গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বিশেষ করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত যে অনেক পিছিয়ে আছে, এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতির তুলনায় ভারত যে চূড়ান্ত ভাবে অনুন্নত, তার থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সে-কথাও বিবেকানন্দ ভেবেছিলেন। ভারতকে ইংরেজরা শুধু কাঁচামালের যোগানদার করেই রেখেছিল,—অথচ এই কাঁচামালের যোগানকে প্রকৃতভাবে ব্যবহার করে ভারতেই যে শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব, বিবেকানন্দ এই ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু কিভাবে যে এই পথে এগিয়ে যাওয়া যায় তার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী বিবেকানন্দের লেখায় আমরা পাইনি,—পাবার কথাও নয়। কারণ বিবেকানন্দ অর্থনীতিবিদও ছিলেন না, বা দেশবাসীকে একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচীর রূপরেখা দেওয়াও তাঁর প্রধান কাজ ছিল না। অথচ তিনি এ-ব্যাপারে যেভাবে চিন্তা করেছিলেন, —সেটিই বিস্ময়কর। রাষ্ট্র-তরণীর কর্ণধারদের উচিত ছিল সেই অর্থনৈতিক চিন্তার মূল সূত্রগুলি আহরণ করে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা কর্মসূচার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা। বিবেকানন্দ তাঁর লেখায় সমবায় আন্দোলনের উল্লেখ করেননি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাঁর জীবিতকালেই ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ডক্টর ভেয়েলিকার সমবায়নীতি সম্পর্কে একটি নীতি প্রস্তুত করেছিলেন। ১৮৯৭ সালে ভারত সরকারের কর্মচারী ফ্রেড রক নিকলসন তিন বছরের জন্য জার্মানী যান সে দেশের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। নিকলসন তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন যে ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। বিবেকানন্দ নিজে অর্থনীতিবিদ ছিলেন না বলে হয়ত সমবায় আন্দোলনের দিকে নজর দেন নি। বিবেকানন্দ যৌথ-খামারের পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তিনি মনে করতেন যে তাতে গরীব কৃষকদের হাতে যা সামান্য জমি আছে তাও চলে যাবে, আর

তারা ভূমিহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু সবাই মিলে মিশে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যে দেশ থেকে অশিক্ষা দূর করার ব্যবস্থা করা উচিত এবং সবার সমবেত প্রচেষ্টায় যে অবহেলিত চাষী, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর হতে পারে সে কথা তিনি বলেছিলেন। বিবেকানন্দ লিখছেন: "প্রত্যেকে পূর্ণ উদ্যম প্রকাশ না করলে কি কোন কাজ সম্পন্ন হয়? ··সিংহহৃদয় কাজের মানুষের কাছেই লক্ষ্মীদেবী এসে থাকেন। পেছন ফিরে তাকানোর প্রয়োজন নেই। আগে চল। আমাদের চাই অনন্ত শক্তি, অফুরন্ত উৎসাহ, সীমাহীন সাহস, অসীম ধৈর্য, তবেই আমরা বড় বড় কাজ করতে পারবো।"[১] একটি জিনিস এক্ষেত্রে বিচার্য। তা হল, বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে আছে একটি আহ্বান, একটি প্রেরণা, এই আহ্বান হচ্ছে দেশের যুব সম্প্রদায়ের প্রতি। দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে হলে, দেশের গরীবদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দিতে হলে যে সংগ্রাম ও উদ্যোগের প্রয়োজন তা একমাত্র দেশের তরুণদের দ্বারাই সম্পন্ন হতে পারে। এজন্য অন্যান্য দেশের যা কিছু ভাল, তা গ্রহণ করতে বিবেকানন্দের আপত্তি ছিল না। দেশের উন্নতির জন্য এবং নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য তিনি যুবকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই সংগ্রামে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য কোনো তত্ত্বের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন ছিল না; প্রয়োজন ছিল না কোনো নির্দিষ্ট মতবাদের। যা করলে দেশের ভাল হয়,—তা-ই করা দরকার। যা করলে দেশের মানুষ দারিদ্র্য, সর্বপ্রকার শোষণ, অশিক্ষা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে,—তা-ই করা দরকার। বিবেকানন্দের আহ্বানের এই মূল কথাটি মনে রাখলে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার তাত্ত্বিক অসম্পূর্ণতা চাপা পড়ে যায়; তার ব্যবহারিক দিকটি-ই উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিবেকানন্দের চিন্তা-ভাবনার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ভারত যে কৃষি-প্রধান দেশ এবং এখানকার অধিকাংশ মানুষই যে কৃষির উপর নির্ভরশীল, বিবেকানন্দ তা জানতেন এবং এজন্য দেশের লোকের অন্নসংস্থান করাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি জরুরী

১। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা অষ্টম খণ্ড ২২১ পৃঃ

কাজ মনে হয়েছিল। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন দরকার তা তিনি স্বীকার করতেন। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দ বলেন: "স্বর্ণপ্রসূ ভারত ভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর চাকরি গুখুরি করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে। ঐ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ তৎপর হতে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—আর তোরা কি করছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্র ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনা।"[২] দেশের কৃষকেরা ও বিশেষ করে ছাত্রেরা বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে কৃষি ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং উন্নত ধরনের প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেশে কৃষি-উৎপাদন বাড়াতে তৎপর হবে স্বামীজী তাই চেয়েছিলেন। এজন্য কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের ওপর তিান গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

দেশের শিল্পায়ন সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তা ছিল খুবই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। জামসেদজী টাটার সঙ্গে বিবেকানন্দের পত্রালাপের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, এবং দেখেছি, দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করার ক্ষেত্রে তাঁর কতটা উৎসাহ ছিল। সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে শিল্প শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারটাও বিবেকানন্দের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মধ্যভারতে হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলার কাছে উর্বর, সজল, স্বাস্থ্যকর জায়গায় বিরাট জমি নিয়ে একটি বড় শিল্প বিদ্যালয় এবং কারখানা স্থাপন করার পরিকল্পনা বিবেকানন্দের ছিল।[৩] বিবেকানন্দ পরিব্রাজক জীবনে ভারতে দারিদ্র্যের যে দুঃসহ রূপ দেখেছিলেন, তাতে তাঁর এই ধারনা হয়েছিল যে শুধু কৃষিতে এই দেশের দারিদ্র্য দূর হবে না, পরিপূরক শিল্প চাই। সেই শিল্পায়নের পদ্ধতি শেখার প্রয়োজন আছে শিল্পসমৃদ্ধ পাশ্চাত্য দেশ থেকে। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ আমেরিকায় বিভিন্ন বক্তৃতায় তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন। লুই বার্ক তাঁর "Swami Viveka-

২। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা নবম খণ্ড, ১৬৪-৬৫ পৃঃ

৩। সরলাবালা সরকার—স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ পৃঃ ১২৯।

nanda in America—New Discoveries" বইয়ে আমেরিকান সংবাদপত্র থেকে নিম্নের সংবাদগুলি সংকলন করে দিয়েছেন :[৪]

"বক্তা তাঁর দেশবাসীদের জন্য তাঁর কর্মোদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন : তিনি দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য সন্ন্যাসীদের সংগঠিত করতে চান—যাতে এই সন্ন্যাসীরা জনগণকে তাঁদের শিল্প-জ্ঞানের ফলদান করতে পারেন। তার দ্বারা ভারতবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।" ['ডেইলি গেজেট', ২৯ আগস্ট, ১৮৯৩]।

"বক্তা তীব্রভাবে ভারতের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের কথা বলেন।···সেখানে অর্ধেক মানুষ দিনে কেবল একবার খাবার জোটাতে সমর্থ; বাকি অর্ধেক জানে না, এক আহারের পরবর্তী আহার কিভাবে জুটবে।·· বক্তা বলেন, ভারতের লক্ষ-লক্ষ ক্ষুধার্ত, পীড়িত মানুষের প্রয়োজন সম্বন্ধে আমেরিকার জনগণকে অবহিত করবার জন্য তিনি এসেছেন।···আমেরিকানরা ভারতে ধর্ম শিক্ষাদানের জন্য মিশনারি না পাঠিয়ে, জনগণকে শিল্পশিক্ষা দিতে পারবে, এমন লোক পাঠালেই ভালো করবে।" ('সালেম ইভনিং নিউজ', ৯ আগস্ট, ১৮৯৩)

"আধুনিক ভারতবর্ষে···মিশনারিরা জনগণকে ধর্মশিক্ষা না দিয়ে সামাজিক ব্যাপারে এবং শিল্পসম্বন্ধীয় বিষয়ে শিক্ষিত করলেই ভালো করবেন।" (ডেইলি গেজেট', ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)।

এই কথাগুলি বিবেকানন্দ বলেছিলেন, আমেরিকায় পদার্পণ করেই,—চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনের আগে। ধর্ম মহাসম্মেলনের পর, "Critic" পত্রিকার লুসি মুনরো লিখেছিলেন (১১ নভেম্বর, ১৮৯৩)। "তাঁর [স্বামীজীর] আমেরিকায় আসার আদি উদ্দেশ্য ছিল ভারতে হিন্দুদের মধ্যে নতুন শিল্পোদ্যোগে আমেরিকানদের আগ্রহী করা।"

স্বামীজীর অর্থনৈতিক চিন্তার একটি বিশেষ দিক নিয়ে (যেটি দেশের

৪। এই সংকলনের বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" (পঞ্চম খণ্ড) বইয়ে পৃঃ ২৪৩।

৫। Louise Burke—Discoveries, এবং শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু—ঐ।

শিল্পায়নের সঙ্গে জড়িত) প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় ১৯৩০ সালের নভেম্বর সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরোয়। এটি যখন লেখা হয় তখন ভারতে গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছে। গান্ধীজী ছিলেন বৃহৎশিল্পের বিরোধী ও কুটিরশিল্পের সমর্থক। কিন্তু প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক তখন দেশের শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তা ধারা সার্থকভাবে তুলে ধরেছিলেন।[৬] স্বামীজীর মতে যন্ত্রশিল্পায়ন থেকেই ভারতের ঐহিক উন্নতি হতে পারে। যন্ত্রশিল্পের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে স্বামীজীর যে দু'একটি উক্তি আছে সেগুলির সতর্ক বিচারও সম্পাদক করেছেন। কিন্তু সম্পাদকের মতে বিবেকানন্দের কোনো উক্তিতেই বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের বিরোধিতা নেই। বিবেকানন্দের কাছে যন্ত্রসভ্যতার প্রধান গুণ হল, এটা জনসমষ্টিকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির উপায় নির্দেশ করে। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের ভাল জিনিস বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন: "তোরা একটা ছুঁচ পর্যন্ত তৈরী করতে পারিস না, তবু ইংরেজদের সমালোচনা করিস! ওরে নির্বোধ, আগে তাদের পায়ের কাছে বসে যন্ত্রশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কার্যকরী বুদ্ধি শিখে নে, যাতে জীবনযুদ্ধে জিততে পারিস।"[৭]

বিবেকানন্দ যে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন তার একটি অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে। অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একটি হল অসম উন্নয়ন-তত্ত্ব (Theory of unbalanced growth)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে যখন যে ক্ষেত্রটির (Sector) দ্রুত উন্নয়ন প্রয়োজন, সেদিকেই বেশি নজর দিতে হবে। যেমন, কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে হয়ত বেশি করে নজর দেওয়া হল কৃষির উন্নয়নের ওপর, যাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে এবং শিল্প-ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন বাড়ে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে

৬। শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে" (পঞ্চম খণ্ড), এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ করেছেন। সেই অংশটি এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।

৭। ঐ।

গেলে দেশের খাদ্যাভাব কিছু কমবে, আবার বিদেশ থেকে খাদ্যসামগ্রীর আমদানিও কমবে; তাতে কিছু বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার সাশ্রয় হবে। সেই বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে শিল্পক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন-সামগ্রী আমদানি করা যাবে; আবার কৃষিক্ষেত্রে কাঁচামালের উৎপাদন বেড়ে যাবার দরুণ শিল্প ক্ষেত্রেও উৎপাদন বাড়বে। এই জিনিসটি আপাতদৃষ্টিতে অসম উৎপাদন বলে মনে হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ উন্নতি হবে তখন এটাই সুষম উন্নয়নের (balanced development) রূপ নেবে। বিবেকানন্দ প্রথমেই খাদ্যাভাব দূর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং এজন্য কৃষির উৎপাদন বাড়াবার কথা বলেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি চেয়েছিলেন যন্ত্রশিল্পের উন্নয়ন। যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নে উন্নতিশীল অর্থনীতির মৌলিক কাঠামোর (infrastructure) বনিয়াদ দৃঢ় হয়। তাছাড়া এই ধরনের শিল্পের উন্নতি হলে বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ জনিত সুবিধা (external economies) এবং আরও পরিপূরক সুবিধা (Complementary benefits) পাওয়া যায়। বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক কিছু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, নতুন বিক্রয়-কেন্দ্রের ও বাজারের সৃষ্টি হয় এবং নতুন কর্মসংস্থানেরও সুবিধা পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ নির্দেশিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পন্থায় আমরা এই সুবিধাগুলি পেতে পারি।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য ও সামগ্রিকভাবে কৃষি-উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়; দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হয় বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের ওপর। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দেরও ছিল এই ধরনের চিন্তাধারা। তবে তার আমলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পদ্ধতি কোনো দেশেই প্রবর্তিত হয় নি; কিন্তু দেশের উন্নয়ন পদ্ধতি কী হবে সে সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ছিল স্পষ্ট।

যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের ফলে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এবং তার কুফলগুলি যে দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে বিবেকানন্দ অবহিত ছিলেন। কলকারখানার স্থাপিত হলে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সস্তায় উৎপাদিত হবে, এটা যেমন ঠিক আবার তার ফলে যে কেউ কেউ ধনী হয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে

নিষ্পেষিত করবে এবং গরীবরা আরও গরীব হবে, এটাও ঠিক। বিবেকানন্দ বলেছিলেন "এমন সামাজিক অবস্থা চিরস্থায়ী হতে পারে না"; "স্বার্থপরতা ও অহমিকাপূর্ণ ধনিক সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।" বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রে আস্থাবান ছিলেন; কিন্তু তার কারণ এই নয় যে এটি একটি নিখুঁত সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু তবুও 'সমাজতন্ত্রী' বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, সমাজের এক শ্রেণীর লোকের বিশেষাধিকারের বিলোপ করে এবং সমাজের মধ্যে যাতে ধন সম্পদের যতটা সম্ভব সমান বণ্টন হয় তার ব্যবস্থা করে দরিদ্রদের আরও দরিদ্র হওয়া থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। উৎপাদন এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বণ্টন ব্যবস্থার উপর জনগণের যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে বৃহদায়তনে যন্ত্রশিল্পের উন্নয়ন সমাজের পক্ষে কল্যাণকারক হবে।

বিবেকানন্দের উত্তরসূরীদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই যুক্তিতে বিশ্বাস করতেন; মহাত্মা গান্ধী করতেন না। সুভাষচন্দ্র যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের উপর এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার উপর জোর দিয়েছিলেন। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে "চরকার" মাধ্যমে এবং কুটির শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। ভারতের মতো এতবড় দেশে যে শুধু কুটির শিল্পের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া যায় না, দেশকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে যে যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণই কাম্য গান্ধীজী এই বাস্তব সত্যটি বুঝতে চাননি। কিন্তু বিবেকানন্দ এই সত্যটি বুঝতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ এটিও বুঝতে পেরেছিলেন যে যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ করতে হবে,—কিন্তু কৃষির উন্নয়নকে অবহেলা করে নয়। আগে প্রয়োজন খাদ্যাভাব দূর করা,—তারপর আসবে শিল্পোন্নয়ন।

শ্রমজীবীদের সম্পর্কে বিবেকানন্দ যা বলেছেন, সেটি বিস্ময়কর। একজন সন্ন্যাসীর মুখে এ ধরনের কথা উনবিংশ শতাব্দীতে অকল্পনীয় ছিল। শ্রমজীবীদের প্রণাম জানিয়ে বিবেকানন্দ যে কথা বলেছেন, সেভাবে বর্তমানকালের মার্ক্সবাদীরা কি কোনদিন ভেবেছেন? বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি বলেছিলেন বিশ্বে শূদ্রদের/সর্বহারাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেটি হবে একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হল, বিবেকানন্দ

ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে এই বিপ্লব প্রথমে আসবে রাশিয়ায় অথবা চীনে। বাস্তবে তা-ই হয়েছে। আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে যে বিবেকানন্দ-চর্চা হচ্ছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী। কিন্তু তাঁর কাছে ধর্ম শুধু কয়েকটি শাস্ত্র ও আচার-বিধিতে আবদ্ধ ছিল না। মানুষের প্রতি অপার ভালবাসা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। সেজন্যই তাঁর চিন্তা ছিল এত বৈপ্লবিক ও বাস্তব। অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে-ই তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছেন: "বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না না, আমি সাধুও নই। আমি গরীব—গরীবদের আমি ভালবাসি,"[৮] এই ভালবাসাই বিবেকানন্দের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাও এই ভালবাসাকে কেন্দ্র করে। তিনি দেশের মানুষকে ভালবাসতেন, দেশকে ভালবাসতেন। দেশের উন্নতির জন্য চিন্তা ই ছিল তাঁর হৃদয়-যন্ত্রণা। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাও সেই হৃদয়-যন্ত্রণারই অভিব্যক্তি।

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা এ-কথাটা ভেবে দেখা দরকার। ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রধান কারণ দেশের দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের মূলে রয়ে গেছে কৃষি ও শিল্পে স্বয়ম্ভরতা অর্জন না করতে পারা, দেশের যতটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এ যাবৎ হয়েছে তার সুষম বণ্টন করতে ব্যর্থতা এবং বেকার সমস্যা। আমরা দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখতে পাচ্ছি, তা এতটা তীব্র হত না যদি কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন আশানুরূপ বাড়ত। বৈদেশিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে সমস্যা আমরা দেশে দেখতে পাই,—সেই সমস্যাও তত তীব্র হত না যদি আমরা অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার দিকে এগিয়ে যেতে পারতাম, ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের চেষ্টা চলছে। বিবেকানন্দও দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে-ছিলেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা তিনি বলেন নি। কিন্তু অর্থনৈতিক

৮। জনগণের অধিকার ৬৮ পৃঃ

পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য যা যা হওয়া উচিত, তার সবগুলিই বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় আমরা দেখতে পাই। অর্থনীতিবিদ না হয়েও স্বামীজী দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার পথে যে সমস্যাগুলির আলোচনা করেছিলেন সেগুলির বর্তমানে প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

শ্রমজীবীদের সমস্যা নিয়ে বিবেকানন্দ যেভাবে চিন্তা করেছিলেন তার প্রাসঙ্গিকতা এখনও যথেষ্ট। এখনও আমরা শ্রমিক-শোষণ দেখতে পাই, এখনও আমরা কৃষি-শ্রমিকদের বেগার খাটানো দেখতে পাই। শ্রমিকরা যে বহুক্ষেত্রে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয় সেটা এখনও সত্য। বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি এই সমস্যাগুলির দিকে সবার দৃষ্টি কেড়েছিলেন। কিন্তু সে যুগে বিবেকানন্দ এই সমস্যাগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন, তখন ছিল ইংরেজ শাসনের যুগ। দেশে শ্রমিক আন্দোলন তখনও গড়ে ওঠেনি। যারা পরবর্তীকালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন তাদের মূল প্রেরণা এসেছিল বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা থেকে। স্বদেশী যুগে দেশপ্রেমের যে জোয়ার আমরা দেখেছিলাম, বিপ্লবীরা যে ফাঁসির মঞ্চকে তুচ্ছ করেও দেশকে স্বাধীন করার প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন,—তার পেছনে প্রেরণার মূল উৎস ছিলেন স্বামীজী যিনি দেশকে জাগাতে চেয়েছিলেন তাম-সিকতা থেকে। আমাদের দেশে ১৯২০ সালে প্রথম সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা (All India Trade Union Congress) গঠিত হয়; এটার পেছনে রাশিয়ার বিপ্লব (১৯১৭) যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আন্দোলনের প্রস্তুতি ছিল আরও আগে থেকে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা ও আদর্শ আমাদের দেশের ত্যাগী যুবকদের শ্রমিক-শোষণ দূর করার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আধুনিক ভারত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে দাবি রাখে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের কথা বলা হয়েছিল। আমাদের দেশে যে-ভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হচ্ছে অথবা যে-ভাবে সমাজ-তন্ত্রের পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, সেটা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) বলে অনেকে মনে করেন। সমাজতন্ত্রের মূল

কথা, সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা,—সমাজের যা কিছু অর্থনৈতিক সম্পদ তার সম-বন্টনের ব্যবস্থা করা, ধনী ও গরীবদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য দূর করা। সমাজতন্ত্রের মূল কথাগুলি সবই বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম সমাজতন্ত্রী তিনি-ই; এটা কারোর স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বিবেকানন্দ তাঁর নিজের যুগের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে ছিলেন,—তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা আজও পুরোপুরিভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশেষাধিকারের বিলোপ এবং সমানাধিকারের প্রচেষ্টা,—এই সমাজতান্ত্রিক নীতি আমাদের প্রথমে শুনিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। আজ ভারতে আমরা পুঁজিপতিদের হাতে এবং মুনাফাখোরদের হাতে অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া দেখতে পাই। আয় ও ধনের বৈষম্য যে আমাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ, তারও উল্লেখ আমরা আগে করেছি।

বিবেকানন্দ এ-জিনিসটি গভীর ভাবে চিন্তা করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা ছিল বৈপ্লবিক। তিনি সমাজের খোলটা পাল্টাতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি জোর দিয়েছিলেন বিশেষাধিক র বিলোপের ওপর এবং প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগ ও অধিকার সৃষ্টির ওপর। আজকের দিনেও তাঁর এই চিন্তাধারা পুরোপুরি অর্থবহ। আজ আমরা প্রায়ই হরিজনদের উপর অত্যাচার দেখতে পাই; প্রকৃতপক্ষে এটা হল নিম্নজাতির উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার। উচ্চবর্ণ ও নিম্নজাতির মধ্যে সংঘাত, অস্পৃশ্যতা বা ছুৎমার্গ প্রভৃতিকে বর্জন করার শিক্ষা আমরা প্রথম পেয়েছি। এক্ষেত্রেও বিবেকানন্দের চিন্তাধারা পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক। আজকের দিনে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা আমরা দেখছি। ভবিষ্যতে যত দিন যাবে, দেশবাসীর কাছে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা যে আরও প্রাসঙ্গিক হবে তার সূচনাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও বিবেকানন্দ চর্চা শুরু হয়েছে; এই জিনিসটা সম্ভব হচ্ছে বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ফলে। দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দেশের যুবকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা দরকার, এবং সেটা আসতে পারে বিবেকানন্দের

বাণী ও রচনা থেকে। স্বামীজীর উক্তি "ভাবিওনা তোমরা দরিদ্র। ভাবিওনা তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখিয়াছে, টাকায় মানুষ করে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি—সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে।"[১]

মানুষের মধ্যে চেতনা ফিরিয়ে আনা, তাকে মহান কর্মযজ্ঞে ঝাপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করা, প্রেম ও ত্যাগের আদর্শকে অবলম্বন করে পরের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করা,—এটাই ছিল বিবেকানন্দের উপদেশ। সমাজের উন্নতি এবং দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বিবেকানন্দের শাশ্বত বাণী চিরকাল দেশবাসীর প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

১। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পঞ্চম খণ্ড, ২১৫ পৃঃ

রাজা রামমোহন রচনাবলী—(সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা)

বঙ্কিম রচনাবলী—(সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা)

নন্দ মুখোপাধ্যায়—বিবেকানন্দের আলোয় সুভাষ (মডার্ন কলাম)

জনগণের অধিকার—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সঙ্কলন (অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল)

ভারতে বিবেকানন্দ—ষোড়শ সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়।

ডক্টর ভবতোষ দত্ত—অর্থনীতির পথে (জিজ্ঞাসা, কলকাতা)

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম সংস্করণ) নব ভারত পাবলিশার্স।

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং শংকর—বিশ্ববিবেক (বাক্ সাহিত্য কলকাতা-৯)

স্বামী বিবেকানন্দ—বাণী ও রচনা।

স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ—বর্তমান ভারত।

স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ—ভারত-কল্যাণ, অনুবাদ ও সংকলন—স্বামী নির্বেদানন্দ (অষ্টম সংস্করণ) রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা ষ্টুডেন্টস হোম।

স্বামী গম্ভীরানন্দ—যুগনায়ক বিবেকানন্দ।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ সম্পাদিত—চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা।

স্বামী-শিষ্য সংবাদ—উদ্বোধন কার্যালয়।

শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কেশবচন্দ্র ও সেকালের সমাজ দ্বিতীয় খণ্ড, বৌভার্স কর্ণার, কলকাতা-৬

শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত—লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (মহেন্দ্র পাবলিশিং কোম্পানী কলকাতা)

শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত—শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু—বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ পঞ্চম, খণ্ড (মণ্ডল বুক হাউস)

Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume.

Marie Louise Burke—Swami Vivekananda in America—New Discoveries, Indian Edition, Advaita Ashrama Calcutta.